KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ২৫/2 মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher সৌরীন্দ্রনাথ দাস
Title আনন্দের খনি	Size 4.5" x 7" 11.43 x 17.78 c.m.
Vol. & Number : ১৭/১ ১৭/৪ ১৭/৫	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৫৯ মাঘ, ১৩৫৯ ফাল্গুন, ১৩৫৯
	Condition : Brittle · Good ✓
Editor : মণীন্দ্রনাথ দাস	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

শনিবারের চিঠি

মাঘ ঃ মূল্য
JANUARY : Pric

সম্পাদক ঃ
শ্রীসজনীকান্ত দ

স্নানযাত্রা

কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক
আনন্দোৎসব—স্নান আমাদের
ত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত
টি একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে

করা হবে না। দৈনন্দিন জীবনেও স্নানের আনন্দ
পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে 'রেণু' সাবান
মেখে স্নান করে দেখবেন। 'রেণু'-র সুগন্ধি
ফেনরাশি শরীর স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে স্নানের
প্রকৃত প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলে মনে। অন্য-গুণে
তুলনায় দামেও 'রেণু' সুলভ।

সোল সেলিং এজেন্ট
হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল কর্পো

সূচী

মাঘ ১৩৫৩

সাহিত্য ও রসতত্ত্ব—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ... ২৪৫
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় কালো-বাজার —শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী ... ২৫৭
'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্মকথা —শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৬১
অগ্নি—"বনফুল" ... ২৭৪
ফাঁদ ... ২৯৪
রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত দলিল ... ২৯৫
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ... ২৯৭
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩০৮
গান্ধী-বাণী-কণিকা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৩১৫
সংবাদ-সাহিত্য ... ৩১৭

শনিবারের চিঠি'র অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৸৹ ও ষাণ্মাসিক ২।৵৹ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৶৹ ও ২।৶৹ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩।৹। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৵১০ ; ভি. পি.তে ।৵৹। বর্ষ আরম্ভ কার্ত্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
[illegible] টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ডাক্তারেরা বলেন—
ব্লাড-ভিটা
দুর্বলতা ও ক্ষয়জনিত যে কোন রোগে আদর্শ টনিক ও রক্ত পরিশোধক!
অধ্যক্ষ মথুর বাবুর
মেডিকেল রিসার্চ লেবরেটরী
পি, ২৩, সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা

লীলা মৃগয়া

আবেগতপ্ত ভাষায় শচীন্দ্র মজুমদারের প্রথম উপন্যাস

সমুদয় রত্নের তিল-তিল আহরণ করে তৈরি হয়েছিল তিলোত্তমা, আর কল্পনার কণা-কণা কান্তি আহরণ করে তৈরি হয়েছিল মীনকেতু। বাস্তব সংসারে আর কি তাদের দেখা মিলবে না? বিক্রমমণ্ডলের দিন কি চলে গিয়েছে? আর কি দেখতে পাব না সেই লীলাঙ্কিতবিক্রম, সে ভ্রূভঙ্গবিলাস? মৃগনয়নার চোখ থেকে কি চলে গিয়াছে মৃগয়া? মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, আছে জটিল রাজনীতি, কিন্তু সর্বোপরি আছে প্রেম, আছে আনন্দ, আছে সৌন্দর্য-পিপাসা। এক বলোদ্ধত যুবক আর এক বলসেবিকা যৌবনোজ্জ্বলা নারী। আবেগতপ্ত শাণিত ভাষায় একটি সম্মোহিত কাহিনী। দাম তিন টাকা।

লরেন্সের গল্প

ইংরাজী সাহিত্যে ডি. এইচ. লরেন্সের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। ইংলণ্ডের বনেদী চালের সাহিত্যের জগতে তিনি কিছুদিন মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন। লরেন্সের সাহিত্য-প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ের অনূদিত গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু, ক্ষিতীশ রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম ৩।৹

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

ইউরোপীয় সাহিত্য-জগতে এর মতো ইদানীং আর কোনো উপন্যাস এতোখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি। নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও ডি. এইচ. লরেন্সের এই বই আজো জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ লরেন্সের অসামান্য প্রতিভা। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনিন্দ্য অনুবাদ। দাম ৩৲

আধুনিক সোভিয়েট গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত করা হয়েছে—আধুনিকতম লেখকের পাঁচটি যুদ্ধকালীন গল্প। এতে বইয়ের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দু-রকম মর্যাদাই অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। আর তার উপরে অচিন্ত্যকুমারের অনবদ্য অনুবাদ। দাম ৩।৹

প্রকাশক : সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস : ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—ক্যাল: ৫১৮১

—ব্রাঞ্চ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী এম-ডি

'শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা' গেঞ্জী

সকলের এত প্রিয় কেন ?

একবার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন

গোল্ডেন পপি সার্ট
সামার-লিলি
ক্যালি-নীট
সুপারফাইন
কালার-সার্ট
লেডী-ভেষ্ট
সুলভ

সামার-ব্রীজ
শো-ওয়েল
হিমানী
ক্রে-সার্ট
সিল্কট
জাভো

সুদীর্ঘকাল ইহার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট—আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন

কারখানা—৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার ৬০৫৬

শনিবারের চিঠি

১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৩

সাহিত্য ও রসতত্ত্ব

[বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব]

নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা আচার্য ভরত 'রস'কে সাহিত্যের বীজরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'রস'বীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি। আবার 'রস'ই কাব্যের ফল—কেন না, কাব্যপাঠের পরিসমাপ্তি রসানুভূতিতে, সহৃদয়ের রসচর্বণায়। এই রসের স্বরূপ কি? 'রস' কাহাকে বলে? সংস্কৃতে 'রস্' ধাতুর অর্থ 'আস্বাদন', এই 'রস্' ধাতু হইতেই 'রস'-শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহাই 'রস'। মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ এই সকলই 'রস', কেন না, বাহ্য জিহ্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদিগকে আস্বাদন করা যায়। সেই জন্যই জিহ্বার অপর নাম 'রসনা'—কেন না, উহার দ্বারা উপরোক্ত ছয়টি বিভিন্ন রসের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে, উহা আস্বাদনের করণ (instrument, organ)। সাহিত্য-রসের ক্ষেত্রেও ব্যুৎপত্তি একই। এখানেও সেই আস্বাদনই অর্থ। শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, বীভৎস প্রভৃতি 'রস' সমস্তই আস্বাদ্য, কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। সাহিত্যরসের উপযুক্ত রসনেন্দ্রিয় সহৃদয়ের অন্তরিন্দ্রিয়, তাঁহার অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত। সাহিত্যিক 'রস' মধুর প্রভৃতি রসের ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, উহা আন্তরেন্দ্রিয়বেদ্য। উহা সাহিত্যের অন্তরতম তত্ত্ব, ঔপনিষদিক ব্রহ্মের মত উহার স্বরূপ গুহানিহিত—'নিহিতং গুহা যৎ'। ভাষার দ্বারা উহাকে স্পর্শ মাত্র করা যায়, উহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় কেবল তাঁহারই নিকট, যিনি উহার অপরোক্ষ মানস অনুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। এই তো গেল 'রস'-শব্দেরব্যুৎপত্তিগত (etymological) অর্থ। কিন্তু রসাস্বাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কি? সহৃদয় শ্রোতা, দর্শক বা পাঠক কি করিয়া অভিনয়দর্শনে বা কাব্যপাঠশ্রবণে রসতত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন? সেই রসানুভবের নিগূঢ় তথ্যই বা কি? কাব্যপাঠ বা অভিনয়দর্শন হইতে যে রসবোধ হইয়া থাকে, তাহা কি শুধু আনন্দেরই জনক, না দুঃখময় অনুভূতিও উহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? যদি আনন্দই রসানুভূতির ফল হয়, তবে সে আনন্দের স্বরূপ কি? সাধারণ লৌকিক আনন্দ বা হর্ষ হইতে উহার কি কোনও বৈলক্ষণ্য আছে? রসের শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর কি না? যদি সম্ভবপর

হয়, তবে সাহিত্যিক রসের সংখ্যা কয়টি? ওইরূপ বিভিন্নতার কারণই বা কি? এ সকল প্রশ্নই অতি দুরূহ। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাঁহাদের মনঃসমীক্ষণ বা অনুব্যবসায় (introspection) বলে তাঁহাদের স্ব স্ব মানসিক বৃত্তিগুলির নিগূঢ় বিশ্লেষণ করিয়া রসের স্বরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষণপদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন মানবের মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম পরিমাপ, তাহার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। দুরূহ রসতত্ত্বের গবেষণার ক্ষুরধার পথে তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল আত্মসমীক্ষণশক্তির তীক্ষ্ণতা। ইহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন রীতির সহিত আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণাপদ্ধতির সংযোগ ঘটাইতে পারিলে রসতত্ত্বের একটা আধুনিক রুচিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হইতে পারে।

রসতত্ত্বের সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা শব্দের 'অভিধা'-শক্তির (function of denotation) দ্বারা প্রকাশ্য নহে। 'রস'কে কখনও কোনও উপায়েই স্পষ্ট কথায় প্রকাশিত করা যায় না। হাস্যরসের অভিনয় দেখিতে গিয়া যদি অভিনেতৃবর্গের পরস্পরের মুখে কেবলই শুনা যায়—'ইহা বড় হাসির কথা', 'আমার বড় হাসি পাইতেছে', তখন প্রেক্ষকবর্গের বদনকমল হইতে যে সকল অমৃতময় বাণী নটগোষ্ঠীর উদ্দেশে বর্ষিত হইতে থাকে, তাহা আদৌ হাস্যরসের অনুরূপ নহে। বাইবেলে আছে, বিধাতা আদেশ করিলেন, 'আলোক হউক', অমনই আলোকের দ্বারা বিশ্ব উদ্ভাসিত হইল। কবি তাঁহার কাব্যে 'রস হউক' বলিয়া আদেশ করিলেই সহৃদয়ের চিত্তে রসবন্যার প্রাদুর্ভাব হয় না। 'গো' শব্দ শ্রবণ করিলেই যেমন একটি প্রতিনিয়ত প্রাণিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ 'শৃঙ্গার' শব্দটি শ্রবণ করিলেই যদি শ্রোতার হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হইত, তবে রস বাচ্য হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা তো অনুভূত হয় না। বস্তুত, যেখানে কোনও বিশিষ্ট রসের বাচক শব্দের দ্বারা সেই রসকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থলে আলঙ্কারিকগণ কবি-প্রতিভার ন্যূনতা লক্ষ্য করিয়া উহাকে কাব্যদোষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সাহিত্যিক দোষবিচারের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে ওইরূপ রসদোষের স্বরূপ আলোচিত হইবে। সুতরাং 'রস' বাচ্য নহে। তবে ইহা কি? সাহিত্য-মীমাংসকগণ রসকে 'ব্যঙ্গ্য' বলিয়াছেন, "স এষ পরমো ব্যঙ্গ্যঃ"। 'ব্যঞ্জনা'র

দ্বারা রসের বোধ হইয়া থাকে, এবং আভাস ও ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করাই ব্যঞ্জনা-শক্তির বৈশিষ্ট্য। কবি যখন 'করুণ'রসের অবতারণা করিতে যান, তখন কেবলমাত্র 'হা হুতাশের দ্বারা তাঁহার কাব্য পূর্ণ করেন না। করুণ রসের ব্যঞ্জনার উপযোগী সামগ্রী তাঁহার কাব্যে সমাবেশ করিয়া থাকেন এবং এই সামগ্রীর যথোপযুক্ত সমাবেশের দ্বারাই কবি সহৃদয় শ্রোতার হৃদয়ে অভিলষিত রস অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। রসাভিব্যক্তির এই সামগ্রী কি? ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে এই সামগ্রীর চারিটি বিশিষ্ট বিভাগ বা শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন।—বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব এবং সঞ্চারিভাব। ইহাদের প্রত্যেকটিই রসানুভূতির অপরিহার্য উপাদান। বিভাব ও অনুভাব রসাভিব্যক্তির বাহ্য উপাদান, উহারা জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের উপলব্ধি সম্ভবপর। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব, রসচর্বণার আন্তর উপাদান, উহারা সহৃদয়ের মনো-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উহাদের স্বরূপবিচার পরভাবী।

'বিভাব' শব্দের অর্থ 'কারণ'। কিসের 'কারণ'? রসানুভূতির। মানবের চিত্তবৃত্তির সহিত জড়জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাধারণ দৃষ্টিতে মনোজগতের সহিত জড়জগতের কোন সম্বন্ধই যেন নাই। ইহারা যেন পরস্পর-অসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু জড় (matter) ও চৈতন্যের (spirit, mind) মধ্যে এই শাশ্বত দ্বন্দ্বের সমন্বয়সাধনই সমস্ত দর্শনের চরম লক্ষ্য। দার্শনিক পণ্ডিতগণের মনীষা এই দুরূহ সমস্যার সমাধানের জন্যই নিয়োজিত হইয়াছে। জড় ও চৈতন্যের পৃথক ও সমান্তরাল (parallel) সত্তা স্বীকার করিয়া লইলেও উহাদের মধ্যে একটি নিদিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সে সম্বন্ধের নাম, কার্যকারণভাব (causality)। চন্দ্রোদয়দর্শনে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সমুদ্রবক্ষের মত স্ফীত হইয়া উঠে; জনহীন মরু-প্রান্তর আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে; অসংখ্যনক্ষত্রমালাবিভূষিত ছায়াপথখণ্ডিত শারদাকাশের সীমাহীন গভীরতা আমাদের চিত্ত বিহ্বল করিয়া তুলে, আমরা বিধাতার বিশ্বসৃষ্টির নিগূঢ়রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হই, বিস্মিত হই। এ সমস্তই মানবপ্রকৃতির উপর জড়জগতের সুদূর-প্রসারী প্রভাবের নিদর্শন। জড়প্রকৃতির এই দুষ্প্রতিরোধ লীলাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রসিদ্ধ সাহিত্যমীমাংসক আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"অয়ি জড়প্রকৃতি! তুমি তোমার প্রকৃত সত্তাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জনগণের হৃদয়কে

লইয়া নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়া কর, তাহাকে অলক্ষ্যে আক্রমণ করিয়া কত বিবিধ বিলাসে নাচাইতে থাক! অথচ বিশ্বের জনসমাজ নিজের সহৃদয়তার অভিমানে তোমাকেই 'জড়', 'অচেতন' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে! আমার মনে হয়, ইহাই সমীচীন, কেন না, জনসমাজই প্রত্যুত 'জড়'। সুতরাং তাহাদের যদি 'জড়' এই আখ্যার দ্বারা নির্দেশ করা হইত, তবে তোমার সহিত তাহারা সমান হইয়া উঠিত। উহাতে কেবল তাহাদের স্তুতিই হইত, নিন্দা নয়।"

আবার কাহাকেও দেখিয়া হয়তো আমরা কুপিত হই, কাহাকেও দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে স্নেহের প্রবাহ বহিতে থাকে। অতএব আমাদের বিভিন্ন পরিবর্তনশীল চিত্তবৃত্তি এই সকল জড়জগতেরই কার্য, জড়প্রকৃতি উহার কারণ। এই সকল কারণকলাপই যখন কবি তাঁহার প্রতিভাবলে কাব্যে বর্ণনা করেন, তখন ইহাদের 'বিভাব' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যাবহারিক জগতে তখন আমরা ব্যাঘ্র প্রভৃতি দেখিয়া ভীত হই, প্রিয়ার সন্দর্শনে প্রেমাকুলহৃদয় হই, তখন ব্যাঘ্র প্রভৃতি কেবলমাত্র আমাদের চিত্তবৃত্তির প্রতি কারণ, লৌকিক কারণ মাত্র। কিন্তু কাব্যপাঠজনিত সহৃদয়ের চিত্তে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, উহা লৌকিক অনুভূতি। 'মেঘনাদবধ' কাব্য পাঠ করিয়া যে 'উৎসাহ' আমাদের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে, যে বীররসের সঞ্চার হয়, উহা লৌকিক 'উৎসাহে'র সহিত সমপর্যায়ের নহে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অথবা মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রভৃতি প্রহসন-নাট্যের অভিনয়দর্শনে আমাদের চিত্ত হাস্যরসের আবেগে যে বিকশিত হইয়া উঠে, উহার সহিত সার্কাসের বিদূষকের (clown) মুখভঙ্গী ও অঙ্গবিকারজনিত কৌতুকময় অনুভূতির তুলনা হয় না। মোট কথা, কবিকর্মজনিত যে সকল ভাববিবর্তন আমাদের মনোজগতে লক্ষিত হইয়া থাকে, উহারা সর্বথা অলৌকিক, উহাদেরই 'রস' এই বহুমানসূচক সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদেশ করা হইয়া থাকে। লৌকিক ভীতি, লৌকিক শোক, লৌকিক হাস্য, লৌকিক প্রীতির সহিত কবিকর্মসমুদ্ভূত ভয়ানক, করুণ, হাস্য অথবা শৃঙ্গাররসের একীকরণ কখনই সম্ভবপর নহে। কবিপ্রতিভার ইহাই অলৌকিকত্ব। এই অলৌকিক প্রতিভা-শক্তির স্পর্শেই ব্যাবহারিক জগতে লৌকিক ভীতির ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে সকল সাধারণ 'কারণ', তাহাই কাব্যজগতের 'বিভাব'রূপে পরিণত হয়। কাব্যজগতের অন্তর্ভূত কার্য কারণ সমস্তই অলৌকিক, রস অলৌকিক, বিভাব অলৌকিক,

সমুদায়ের মূলে আছে অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণ। সুতরাং ব্যাবহারিক জগতের যাহা কারণমাত্র, কবিকর্মের কাল্পনিক বিশ্বে তাহাই 'বিভাব'। উভয়ে সম গোত্রীয় হইলেও অভিন্ন নহে। একটি লৌকিক, অপরটি অলৌকিক। একটি বিধাতৃবিরচিত বিশ্বের দুর্লঙ্ঘ্য কার্যকারণশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অপরটি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, মম্মটাচার্যের ভাষায় 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত', কবিপ্রজাপতির শৃঙ্খলহীন যদৃচ্ছাই উহার একমাত্র নিয়ামক, জড়জগতের নিয়ম উহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, উহারা 'নিয়মের রাজত্বে'র বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

এই 'বিভাব' বা সাহিত্যিক কারণ-কলাপ আবার দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত—একটির নাম 'আলম্বন'বিভাব, অপরটির নাম 'উদ্দীপন'বিভাব। আলম্বন শব্দের অর্থ বিষয়,—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়। আমাদের চিত্তের যত কিছু বৃত্তি বা বিকার (modification), তাহা কোনও না কোনও একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়। যখন ঘটজ্ঞান হইল,—তখন আমাদের চিত্তের যে জ্ঞানাত্মক পরিণাম (consciousness) সংঘটিত হইল, উহার 'আলম্বন' বা বিষয় একটি নির্দিষ্ট ঘট। মোট কথা, আলম্বন বা বিষয়ই আমাদের চিত্তবৃত্তির মুখ্য কারণ। 'ঘট' না থাকিলে উহাকে আলম্বন করিয়া যে ঘটবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল,—তাহা আদৌ সম্ভবপর হইত না। সাহিত্যক্ষেত্রেও সহৃদয়ের যে রসাত্মক চিত্তবৃত্তি,—তাহারও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। কোনও একটি বিশিষ্ট কারণকে আলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভাববিকার বা emotion জন্মলাভ করে। ঐরূপ বিভাবকেই সাহিত্যমীমাংসকগণ 'আলম্বন-বিভাব' কহিয়া থাকেন। যেমন, 'অভিজ্ঞানশাকুন্তল' নাটকে দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে রতিভাব বা শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে,—উহার আলম্বনবিভাব শকুন্তলা। কেন না, শকুন্তলা-সন্দর্শনেই মহারাজ দুষ্মন্তের কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে। সেইরূপ, শকুন্তলাও দুষ্মন্তের দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি অনুরাগপরবশা হন। অতএব, আর একদিক হইতে আলোচনা করিলে শকুন্তলার ভাববিকারের 'আলম্বন-বিভাব' মহারাজ দুষ্মন্ত স্বয়ম্। এইরূপে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পরস্পর পরস্পরের রতিভাবের প্রতি আলম্বন। অন্যান্য রসের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। 'বেণীসংহারে' ভীমের যে রৌদ্ররস, উহার আলম্বন-বিভাব দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণের অপমানজনক বীভৎস দৃশ্য। মেঘদূতের নির্বাসিত যক্ষের 'বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে'র আলম্বন-বিভাব বিরহিণী যক্ষপত্নী। অপর পক্ষে, 'উদ্দীপন-

বিভাব' ঠিক এইরূপ অর্থে আমাদের চিত্তবৃত্তির প্রতি কারণ নহে। উদ্দীপন-বিভাব না থাকিলে আমাদের চিত্তবৃত্তি আদৌ জন্মলাভ করিত না—এইরূপ দাবি করা চলে না। যাহা অস্ফুট ছিল তাহাকে স্ফুট করা, যাহা অর্ধপ্রসুপ্ত ছিল তাহাকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করা, যাহা মুকুলিত ছিল তাহাকে ফলিত করা, যাহা ছিল স্তিমিত তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া তোলাই উদ্দীপন-বিভাবের উপযোগিতা। ইংরেজীতে ইহাকে auxiliary cause বা সহকারি-কারণ বলা চলে। যেমন, সাহিত্যে প্রায়শই বসন্তের আবির্ভাব, প্রেমসঙ্গীত, নায়কনায়িকার অভিসারসজ্জার বর্ণনা শৃঙ্গাররসের অঙ্গরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সমস্তই নায়কনায়িকার প্রীতিকে অধিকতর উজ্জীবিত করিয়া তোলে,—নায়িকার চরণের নূপুরনিক্কণ, তাহার বলয়ের শিঞ্জিতধ্বনি প্রতীক্ষমান নায়কের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলে। ওই সকলই অনুভবসাক্ষিক। বর্ষাসমাগম বিরহের উদ্দীপন-বিভাব। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতের অনবদ্য মন্দাক্রান্তায় ইহার উদ্বোধন চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, যক্ষের বিরহবেদনাকে উদ্দীপিত করিবার জন্য—"আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে হৃদয়সাগর উপকূল।" অতএব প্রত্যেক রসেরই একটি উপযুক্ত পরিবেশ আছে—এই পরিবেশের উদ্দেশ্য প্রতিপাদ্য রসের উৎকর্ষসাধন, এবং পরিবেশেরই আলঙ্কারিক সংজ্ঞা 'উদ্দীপন-বিভাব'।

অতএব, বিভাবের স্বরূপ বুঝা গেল। এক্ষণে 'অনুভাবে'র স্বরূপ আলোচনীয়। 'অনুভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'পশ্চাৎ-(অনু)-ভাবিতা-(ভাব)'। প্রশ্ন হইতে পারে: এই পাশ্চাত্ত্য বা পরভাবিতা কাহাকে অপেক্ষা করিয়া? উত্তরে আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন: লৌকিক ভাব বা চিত্তবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়া। ব্যাবহারিক জগতে আমাদের হৃদয়ে যখন কোনও ভাব উদ্গত হয়, যেমন—ক্রোধ, ভয়, শোক প্রভৃতি, তখন সেই ভাব-বিকৃতির অব্যবহিত পরেই শারীরিক বিকার (physical modification) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির নেত্র আরক্ত হইয়া উঠে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, হস্তের আস্ফালন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল শারীরবিকৃতি ক্রোধরূপ ভাববিকারেরই অনন্তরভাবি অব্যভিচারি কার্য।(১) সেইজন্য ইহারা

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রত্যাখ্যানকুপিতা লুৎফুন্নিসার বর্ণনা লক্ষণীয়: "ললাট-দেশে ধমনীসকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দিল; জ্যোতির্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ স্খলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল।"

ক্রোধের 'অনুভাব'রূপে কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, মুখবর্ণের পাণ্ডুতা, রোমাঞ্চ, স্বেদশ্রুতি, পলায়নপ্রবৃত্তি প্রভৃতি শারীরবিকার লৌকিক ভয়াত্মক (fear) চিত্তবৃত্তির কার্য,—সুতরাং ইহারা লৌকিক ভীতির অনুভাব। সংস্কৃত রসমীমাংসকগণ অতি নিপুণভাবে বিভিন্ন চিত্তবিকারের সহচারী অনুভাবসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশ'-গ্রন্থে আন্তর ভাব-বিকারের সহিত বাহ্য শরীরবিকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের অতুলনীয় মনোবিশ্লেষণনৈপুণ্যে ও পর্যালোচনা-শক্তির তীক্ষ্ণতায় সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। অতএব বুঝা গেল, সাহিত্যিক বিভাব লৌকিক কারণের সমগোত্রীয়, সাহিত্যিক অনুভাব লৌকিক চিত্তবৃত্তি-জন্য কার্যের সজাতীয়। কিন্তু অনুভাবের ক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অনুভাব প্রকৃতপক্ষে লৌকিক চিত্তবৃত্তির কার্য হইয়াও সাহিত্যিক রসাত্মক চিত্তবৃত্তির কারণ। বিভাব যেমন সাহিত্যরসের কারণ, অনুভাবও তুল্যরূপে সাহিত্যরসের কারণ। ব্যাবহারিক জগতের 'কার্য' কিরূপে কাব্যজগতে 'কারণে'র পদবীতে উন্নীত হইতে পারে, ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহা বিচার্য। এক্ষণে সাহিত্যিক রসের দুইটি অবশিষ্ট উপাদান 'স্থায়িভাব' ও 'সঞ্চারিভাব', ইহাদের স্বরূপ বিচার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, 'স্থায়ি ও সঞ্চারিভাব, রসচর্বণার আন্তর উপাদান,' ইহারা সহৃদয়ের মনোজগতের সহিত সম্পৃক্ত।

মানুষ কখনও বাসনাহীন হইয়া এই জগতে জন্মলাভ করে না। কতকগুলি প্রবৃত্তি তাহার সহজাত—congenital। মহর্ষি গৌতম তাঁহার ন্যায়সূত্রে বলিয়াছেন, "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ"। যতদিন রক্তমাংসগঠিত দেহপিঞ্জরের মধ্যে আত্মা বদ্ধ হইয়া থাকিবে, ততদিন পূর্বজন্মের বাসনা বা impression বা প্রবৃত্তিসমূহ তাহার সহিত নিত্য সমবেত হইয়াই থাকিবে। পুনর্জন্মবাদ স্বীকার না করিলেও যদি পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় মানবের ক্রমবিবর্তনবাদ স্বীকার করাও যায়, তথাপি দীর্ঘকালের অভিব্যক্তিবশে যে সকল ভাবনা বা বাসনা মানব-মনে দৃঢ়মূলভাবে রোপিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ হইতে শিশুতে, এক যুগ হইতে অন্য যুগে, সঞ্চারিত হইবেই—তাহাদের বিলোপসাধন কোনও ক্রমেই মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাদের কতকগুলি আমাদের চিত্তের উপরিস্তরে ভাসমান। তখন তাহাদের সত্তা জ্ঞানালোকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি হয়তো মানবমনের গভীরতম স্তরে

অজ্ঞাতভাবেই আপন সত্তা বজায় রাখিয়া চলে—তাই বলিয়া তাহাদিগকে অপহ্নব করা যায় না। ইহা Freud-প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। আমাদের প্রাচীন দার্শনিক আচার্যগণ বহুপূর্বেই এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবজাত শিশুর অপরিচিত পরিবেশ দর্শনে রোদনের মূলে আছে পূর্বজন্মসঞ্চিত ভয়াত্মক বাসনা (instinct of fear)। এইভাবে পূর্বজন্মের অনুভবজনিত সংস্কার-(impression)-রূপেই হউক, অথবা মানব-সমাজের দীর্ঘযুগপ্রবাহী ক্রমবিবর্তনের ফলেই হউক, ভয়, শোক, ক্রোধ, অনুরাগ, হাস, বিস্ময়, জুগুপ্সা, উৎসাহ, শঙ্কা, গ্লানি, অসূয়া, উদ্বেগ, নিশ্চয়—মানবের মনোজগৎ এইরূপ শত শত বিচিত্র বাসনার দ্বারা নিরন্তর শবলিত হইয়া আছে। এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে সাহিত্যমীমাংসকগণ দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, একটির নাম 'স্থায়ী', অপরটি 'সঞ্চারী'। আলঙ্কারিকগণের মতে স্থায়িভাবের সংখ্যা আটটি বা নয়টি—রাত, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়। স্থায়ী শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ permanent। অপরপক্ষে ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের (transient states of mind) সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ।(১) স্থায়ী ও সঞ্চারিভাবের মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে খুব গভীর নহে। রতি, ভয়, শোক প্রভৃতি ভাব যেমন বাসনা বা সংস্কাররূপে মানব-মনের সহিত সম্বদ্ধ, নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া প্রভৃতি সঞ্চারিভাবও সংস্কাররূপেই আমাদের মনোজগতের উপাদানরূপে পুরুষপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং উভয়েই সমানরূপে সংস্কার। রতি বা ভয় যেমন instinctive বা সংস্কারপ্রসূত, শঙ্কা, অসূয়া প্রভৃতিও তুল্যরূপে instinctive। তবে প্রভেদ কিসে? রতি প্রভৃতি আটটি ভাবই বা কেবল স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইবে কেন? এইরূপ পরিগণনার পক্ষে যুক্তি কি? অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁহার ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন: এই আটটি (বা নয়টি) মাত্র ভাবই কেবল স্থায়ী। কেন না, প্রাণী জাত হইবা মাত্রই এই কয়টি সংবিদ্ বা বাসনার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সকলেই জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই

(১) যথা—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক।

দুঃখের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সুখাস্বাদবিষয়ে তৎপর হইয়া উঠে। ইহারই অপরসংজ্ঞা রিরংসা বা রতি। এইরূপে স্বোৎকর্ষাভিমানও তাহার সহজাত বৃত্তি, তাহার ফলে পরকে উপহাস করিবার প্রবৃত্তি তাহার আত্মোপার্জিত। আবার, ঈপ্সিতবস্তুর বিয়োগে তাহার চিত্ত স্বতই শোকাকুল হইয়া উঠে, এবং ঐ বিয়োগের যাহা হেতু, সেই বস্তুর প্রতি তাহার চিত্ত কোপপরবশ হয়, সুতরাং এই কোপও প্রাগ্‌ভবীয় বাসনার অঙ্কুররূপে তাহার চিত্তে রোপিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, নিজের শক্তিহীনতা দর্শনে সে সহসা ভয়াকুল হয়। সুতরাং এই ভীতিও তাহার পূর্বজন্মসঞ্চিত বাসনারই লেশমাত্র। এইরূপে উৎসাহ, বিস্ময়, নির্বেদ প্রভৃতি অবশিষ্ট চিত্তবৃত্তিসমূহও তাহার সহজাত সংস্কার। এই সকল চিত্তবৃত্তি বিরহিত হইয়া কোনও প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে না।—"ন হ্যেতচ্চিত্তবৃত্তিবাসনাশূন্যঃ প্রাণী ভবতি"। হয়তো ব্যক্তিভেদে এই সকল বাসনার কোনও একটির ন্যূনতা বা আধিক্যমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও 'রতি'-বাসনা প্রবল, অন্য সমস্ত সংস্কার তাহার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া থাকে; কাহারও বা কোপ সমধিক দৃঢ়মূল। অপরপক্ষে, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহ সমুচিত বিভাব বা কারণের অভাবে জন্মমধ্যে একবারও উৎপন্ন না হইতে পারে। যেমন, রসায়নসেবী যোগী তাঁহার দীর্ঘজীবনে একবারের জন্যও গ্লানি বা আলস্য বা শ্রম প্রভৃতি অনুভব করেন না। সমুচিত কারণের দ্বারা এই সকল চিত্তবৃত্তি যদিও বা অভিব্যক্ত হয়, তথাপি সেই কারণ যখন অপগত হয়, তখন তজ্জনিত গ্লানি, শঙ্কা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহও যুগপৎ ক্ষীণ হইয়া যায়, চিত্তের মধ্যে তাহাদের কোনও চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকে না, অনভিব্যক্ত সংস্কাররূপেও নহে। কিন্তু রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা প্রভৃতি আটটি (বা নয়টি) চিত্তবৃত্তি, অলঙ্কারিকগণের মতে যাহাদের সংজ্ঞা স্থায়িভাব, তাহাদের কখনও সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা যায় না। কোনও একটি বিশিষ্ট বিষয়ে 'উৎসাহ' নষ্ট হইলেও, অপর একটি বিষয়ে 'উৎসাহ' আমাদের চিত্তে অনুবৃত্ত হইয়াই থাকে। (হংসপাদিকা যখন 'সকৃৎকৃতপ্রণয়' মহারাজ দুষ্মন্তের রতি বা প্রণয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তখন শুদ্ধান্তের অন্য মহিষীগণও যে মহারাজের প্রণয় হইতে যুগপৎ বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এইরূপ আশঙ্কা ভিত্তিহীন।) সেইজন্য মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'ন হি চৈত্র একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্ত ইত্যন্যাসু বিরক্তঃ'-ইতি। কোনও একটি বিশিষ্ট রমণীর প্রতি চিত্তের অনুরাগের দ্বারা

অন্য রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ অনুমান করা যায় না। যদিও সাময়িকভাবে রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির কোনও একটি সম্পূর্ণ প্রক্ষীণ বা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে বটে, তথাপি অনভিব্যক্ত সংস্কাররূপে উহারা চিত্তের অন্তস্তলে গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। অভিনবগুপ্তাচার্য এই স্থলে একটি উদাহরণের দ্বারা স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন: "স্থায়িভাবসমূহ যেন রক্ত-পীত-নীল-হরিতাদিবর্ণের দ্বারা রঞ্জিত কতকগুলি সূত্র। এবং এই সূত্রের দ্বারাই যেন ক্ষণিক উদয়ব্যয়শালী বিচিত্র লীলাগর্ভ স্ফটিক-কাচাভ্রশকলের ন্যায় স্বচ্ছ ব্যভিচারিভাবসমূহ নিরন্তর গ্রথিত রহিয়াছে। রক্তনীলাদিসূত্রস্থিত স্ফটিকখণ্ডসমূহ যেমন সূত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পদ্মরাগ, মরকত, মহানীল প্রভৃতি বিচিত্র রত্নের আকারে প্রতিভাত হয়, দুইটি স্ফটিকখণ্ডের মধ্যবর্তী অবকাশ যেমন সূত্রবর্ণরঞ্জিত স্ফটিকখণ্ডদ্বয়ের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ব্যভিচারিভাবসমূহ রতি, ক্রোধ, হাস, শোক প্রভৃতি স্থায়িসূত্রের বৈচিত্র্যে রঞ্জিত হইয়া উঠে, এবং পূর্বাপর ব্যভিচারিভাবদ্বয়ের সেই প্রতিফলিত বৈচিত্র্যই আবার সূত্রস্থানীয় স্থায়িভাবকে নব নব ভঙ্গীতে শবলিত করিয়া তাহাদের মধ্যে অপরূপ মনোহারিতা ও আস্বাদনীয়তার সঞ্চার করে। অতএব, দৃঢ়মূল স্থায়িভাবসমূহই ব্যভিচারিভাব-সমূহের একমাত্র ভিত্তি। ব্যভিচারিভাবসমূহের চিত্তভূমির সহিত স্বতন্ত্র, স্থায়িনিরপেক্ষ কোনও যোগ বা সম্বন্ধ নাই। স্থায়ির ব্যাপক সত্তা হইতেই তাহাদের উদ্ভব; স্থায়ী হইতে প্রতিবিম্বিত বৈচিত্র্যই তাহাদের সহস্র বিচিত্র বিলাসের মূলে। তথাপি এই প্রতিফলিত বিলাসবৈচিত্র্যের পুনঃপ্রতিফলনই আবার স্থায়িকে রমণীয়তা দান করে। এইরূপে স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব পরস্পরোপকারী।(১) স্থায়িভাব সমুদ্রের মত ব্যাপক, উদয়ব্যয়হীন; ব্যভিচারি-ভাবসমূহ সমুদ্রবক্ষের আবর্তের মত, বুদ্বুদের মত, কল্লোলের মত পরিবর্তনশীল, বৈচিত্র্যশতশালী। স্থায়ী হইতে ব্যভিচারিভাবের জন্মলাভ, স্থায়িভাবেই তাহার স্থিতি, স্থায়িতেই তাহার অস্তময়।(২) ভরতাচার্য এই আটটি ভাবকেই কি জন্য স্থায়ী বলিয়াছেন, তাহার প্রতি তিনি স্বয়ং কোনও যুক্তি দেন নাই।

(১) অভিনবভারতী, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৮৪। অভিনবগুপ্তের উপরিবর্ণিত উদাহরণই পরবর্তী আলঙ্কারিকগণের 'প্রকৃসূত্রন্যায়ে'র মূলে।

(২) দশরূপক, ৪।৭ ও ধনিককৃত 'অবলোক' দ্রষ্টব্য।

অভিনবগুপ্তাচার্যই সর্বপ্রথম ভরতাচার্যের এই আপাতদৃষ্টিতে যাদৃচ্ছিক বিভাগের দর্শন ও মনঃসমীক্ষণসম্মত ভিত্তি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী কালের আলঙ্কারিকগণ বোধ হয় 'অভিনবভারতী'র উপরি-উদ্ধৃত অংশটুকু লক্ষ্য করেন নাই। কেন না, এক হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসন'-গ্রন্থেই অভিনব-গুপ্তের টীকার ঐ অংশটুকু হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদিও তিনি তাঁহার আকরের (source) নাম উল্লেখ করেন নাই।(১) 'রামগঙ্গাধর'-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কেবলমাত্র ভরতাচার্যের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন, কিছুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রদর্শনের চেষ্টাই করেন নাই।(২) যেহেতু মুনি রতি, হাস, ক্রোধ, শোক, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং নির্বেদ এই নয়টি মাত্র চিত্ত-বৃত্তিকে স্থায়িভাবরূপে পরিগণনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা মুনিবচনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এবং স্থায়িভাবসমূহই যেহেতু ভরতাচার্যের মতে রসপদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেইহেতু সাহিত্যিক-রসের সংখ্যাও যথাক্রমে নয়টি—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। অনেকে বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রসান্তর স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভরতাচার্যের মতে উহা অসম্ভব। পুত্রের প্রতি মাতাপিতার যে রতি বা স্নেহ, উহা কখনও স্থায়িভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দেবাদিবিষয়ক রতি, যাহা হইতে ভক্তির উদ্ভব, তাহাও স্থায়িভাব নহে। উহারা ব্যভিচারিভাব মাত্র(৩); এবং ব্যভিচারিভাব কখনও স্থায়িভাবের মত পূর্ণ, স্বতন্ত্র আনন্দময় অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। স্থায়িভাবেরই কেবলমাত্র সেই শক্তি ও মহিমা আছে। সেইজন্য

(১) কাব্যানুশাসন, পৃ. ৮৩-৮৪ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

(২) এক স্থলে তিনি ভরতাচার্যকৃত বিভাগের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সমর্থন খুব সন্তোষজনক হইয়া উঠে নাই: "তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদমীষং ভাবানাং স্থায়িত্বম্। ন চ চিত্তবৃত্তিরূপাণামেষামাশুবিনাশিত্বেন স্থিরত্বং যুক্তম্। বাসনারূপতয়া স্থিরত্বং তু ব্যভিচারিষু অতিপ্রসক্তম্—ইতি বাচ্যম্। বাসনারূপাণাম্ অমীষং মুহুর্মুহুরভিব্যক্তেরেব স্থির-পদার্থত্বাৎ। ব্যভিচারিণাং তু নৈব, তদভিব্যক্তেরিদ্যুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাৎ।"—রসগঙ্গাধর, পৃ. ৩৭ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

(৩) রসগঙ্গাধর পৃ. ৫৬, ৯৪। Watson তাঁহার *Behaviorism*-গ্রন্থে যৌনরতি, পুত্রাদিবিষয়ক রতি, প্রভৃতি এবংজাতীয় সমস্ত চিত্তবৃত্তিকেই একশ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: Love responses include "those popularly called 'affection-

ভরতাচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন, "স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ"।(১) মানবের মনোজগতে স্থায়িভাবের আসন সর্বাগ্রে, স্থায়িভাবটি যেন বীণার মূল সুর,

ate', 'good natured', 'kindly',...as well as responses we see in adults between the sexes. *They all have a common origin*,"—C. K. Ogden প্রণীত *The A B C of Psychology* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪০ (London : Kegan Paul. Trench Trubner & Co. Ltd, 1941).

(১) ব্যভিচারিভাবসমূহ যে রস বা emotionরূপে পরিণত হইতে পারে না,—ইহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারাও চিত্তবৃত্তিগুলিকে স্থায়ী ও ব্যভিচারী—এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। অধ্যাপক Ogden belief ও doubt—প্রাচ্য সাহিত্যমীমাংসকগণের মতে যে দুইটি চিত্তবৃত্তিকে যথাক্রমে 'মতি' ও 'বিতর্ক' এই দুইটি ব্যভিচারিভাবের সহিত তুলনা করা যায়—তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "It remains to discuss two other topics *which less evidently come under the heading of emotional phenomena*. One of these includes belief, doubt, prejudice, and so forth ; the other deliberation, resolve, and the fluctuations of the will...But when we analyse the states of consciousness known by these names we find that the distinctive character of a crisis of belief or doubt is a feeling, of the same general kind as joy, for example, or fear, though unique in flavour. Expectation, bare assent, and familiarity are examples of such belief feelings. *They are generally less intense than emotions*, although pathological forms of doubt and ecstatic belief are not infrequent."—*The A B C of Psychology*. পৃ. ২০৫-৬; 'সংশয়' বা 'নিশ্চয়' কখনও কোনও ব্যক্তির মুখ্য চিত্তবৃত্তি (consent) হইতে পারে না। যদি হয়,—তাহার নিজের মস্তিষ্ক বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হইবে, যাহার পরিণাম মানসিক অপমৃত্যু—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'। Ogden বলিয়াছেন—"'...in doubting manias everything can be doubted. The peatient may sometimes even doubt whether he exists." —ঐ, পৃ. ২০৭। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সংশয় বা নিশ্চয় বা অন্যান্য চিত্তবৃত্তি যাহাদের ব্যভিচারিভাবরূপে পরিগণনা করা হয়,—তাহারা চিত্তের মধ্যে কোনও স্থায়ী সংস্কার বা Impression রাখিয়া যাইতে পারে না: "It may be that the intensity of the belief-feeling is no criterion of the permanence of the disposition which it leaves behind. Many people who experince the most intense beliefs are also the most changeable and instable in their conviction."—Belief (মতি), doubt (বিতর্ক) প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবগুলি যে মূলত কতকগুলি স্থায়িভাব—যেমন, রতি, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়, এবং তাহারা পরস্পর যে পরস্পরের মধ্যে নবীনতা ও বৈচিত্র্য আধান করিয়া থাকে, ইহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন: "As a rule,...

ব্যভিচারিভাবসমূহ তাহারই যেন অনুরণন—harmonics শাস্ত্রে, যাহাকে বলা হয় under tone। ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন, "মানবের মধ্যে নরপতি যেমন শ্রেষ্ঠ, শিষ্যসংসদে গুরু যেমন বরেণ্য, সেইরূপ ভাব-সমাজে স্থায়িভাব সর্বাপেক্ষা মহান্।"(১) সেই স্থায়িভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্যই সাহিত্যের যতকিছু সামগ্রী,—বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, তাহাদের সমাবেশবিষয়ে কবি তৎপর হইয়া থাকেন। আমরা রসচর্বণার উপাদানসমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় কালো-বাজার

দীর্ঘ ছ-বছরের পর চতুঃস্বাধীনতার লড়াই থেমেছে ; মিত্রশক্তির জয়জয়কার হোক। খুনে-লড়াই শেষ হয়ে শুরু হয়েছে এখন পরিকল্পনা-লড়াই। বোম্বাই-পরিকল্পনা, দিল্লী-পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয়-পরিকল্পনা, প্রাদেশিক-পরিকল্পনা প্রভৃতি নানা নামের পরিকল্পনারা ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করেছে ; ওদিকে আবার পথ-পরিকল্পনা, যান-বাহন-পরিকল্পনা, বিজলী-পরিকল্পনা, জলসেচন-পরিকল্পনা, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আরাম-পরিকল্পনা ইত্যাদিরাও কিলবিল করছে। এইসব বিচিত্র পরিকল্পনাকে খাড়া করবার জন্যে চুনো-পুঁটি দেশী পরিকল্পকরা কোমর বেঁধেছেন, রুই-কাতলা বিদেশী পরিকল্পকও আমদানি করা হচ্ছে। তোড়-জোড় হৈ-চৈ দেখে মনে হয়, এবার আর ভারতের নিস্তার নেই, ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হয়ে যায় না। আমাদের ধৈর্য বিশ্ববিখ্যাত ; অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাই আমরা প্রতীক্ষা করি পরিকল্পিত-নবভারতের জন্মদিনের। তেল যখন মাখবই, অকাতরে কড়ি ফেলে যাওয়াই

the belief or doubt feelings are very subtly interwoven with the other emotions. We rarely believe strongly unless some emotion—it may be joy or fear, pride or humility—is reinforcing the belief. And doubt, more evidently, perhaps, is commonly dependent upon a prior clash of interests and a resultant emotion... But if *these intellectual feelings spring from other emotions they also give rise to them*, since they modify so fundamentally the course of our responses."

—ঐ, পৃ. ২০৭। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসকগণের মতবাদের সহিত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকগণের এতগুলি বিষয়ে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সংবাদ সত্যই বিস্ময়কর। উদ্ধৃত ইংরেজী সন্দর্ভটির সহিত অভিনবগুপ্তাচার্যের স্থায়ি-ও ব্যভিচারিভাবের পার্থক্যপ্রদর্শক যুক্তিসমূহ তুলনীয়।

(১) নাট্যশাস্ত্র ৭।৮

আমাদের একমাত্র কর্তব্য। পেট-ভরা খাবার যখন আমরা পাবই, তখন কিছুদিন আর অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকতে পারব না? লম্বা কোঁচা যখন একদিন ঝোলাবই, কিছুকাল আর দিগম্বর হয়ে থাকতে পারব না? এত বড় যুদ্ধ আর এত বড় দুর্ভিক্ষ যখন সইতে পারলুম, এই সামান্য অন্নবস্ত্রের অস্থায়ী কষ্টটা আর সইতে পারব না?

আর কষ্টই বা সইতে হবে কেন? বেঁচে থাক্ যুদ্ধ-জাত নব-প্রতিষ্ঠান কালো-বাজার। এই সনাতন ভারতবর্ষে সর্বদুঃখহারী যদি কেউ থাকে, তবে সে ভগবান নয়, সে ওই কালো-বাজার। কালো-বাজার যেন দ্বাপরের কালো-সোনা। কালো আদমীর দেশে কালো-বাজার যে কত উপকারী, সাদা আদমীর কটা-চোখে সেটা হয়তো ধরা না পড়তে পারে; সাদা-পরিকল্পকরা এ বাজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপেক্ষা ক'রে হয়তো যুদ্ধকালীন আটচালা-পাঁচিলের মত এটিকেও ভেঙে ফেলতে পারেন। সে অনর্থপাত যাতে না হয়, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় কালো-বাজার যাতে বিশিষ্ট স্থান পায়, সে বিষয়ে আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে এবং এমন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করতে হবে, যাতে এই শিশু-প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

কালো-বাজারে প্রবেশ করলে দেখা যায়, এ বাজার চলছে পুরোপুরি অর্থনীতিশাস্ত্রসম্মত নিয়মে। সমস্ত জিনিসের দাম ঠিক হয় আমদানি ও চাহিদা অনুযায়ী। চাহিদা যদি আমদানির চেয়ে অনেক বেশি হয়, জিনিসের দামও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে; পণ্য যদি বিলাস-দ্রব্য না হয়ে নিত্য-ব্যবহার্য ও অপরিহার্য দ্রব্য হয়, তা হ'লে তো আর কথাই নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই শাশ্বত নিয়মেই এ বাজার চলে, এখানে অসঙ্গতি বা অন্যায় কিছুই থাকতে পারে না। এই সাদাসিধে নিয়মে যে বাজার চলে, তাকে যিনি "কালো-বাজার" নাম দিয়েছেন, তাঁর মনের কালিমা নিশ্চয়ই ঘোচে নি।

কালো-বাজারের উপকারিতা অসীম। এই বাজার ছিল ব'লেই পঞ্চাশের মন্বন্তর মাত্র ৩০ লক্ষ মুড়োতেই ক্ষিদে মিটিয়েছে। উডহেড-কমিশন অবশ্য সরকারী-বেসরকারী সাহায্য-প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছেন; কিন্তু কালো-বাজারের প্রাপ্য সুখ্যাতিটা যে কেন তাঁরা দিলেন না, তা জানি না। আজও যে চাকুরেরা ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে আপিসে যান এবং চাকুরে-গিন্নীরা শাড়ি-ব্লাউজ প'রে সিনেমায় যান, এর কতখানি যে কালোবাজার-প্রসাদাৎ, তা

সকলেই জানেন। বাপ-মার গঙ্গালাভ হ'লে সৎকার থেকে শ্রাদ্ধ-শান্তি পর্যন্ত যাবতীয় ব্যবস্থা কালো-বাজারের ওপর দিয়ে কতখানি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, ভাগ্যহীনরা সকলেই তা জানেন। আদিম বাপ-মার কোলে ফিরে না গিয়ে আজও যে আমরা সামাজিক ও গার্হস্থ্য-জীবন বজায় রাখতে পেরেছি, সেটা শুধু কালো-বাজারের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে। কাজেই কোন মতেই আমরা এ বাজারের উপকারিতা এবং আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারি না।

কালো-বাজারকে জীবন্ত ও উন্নত রাখতে হ'লে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা দরকার—(১) চিরস্থায়ী মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন। (২) চিরস্থায়ী খাদ্য-বণ্টনের প্রবর্তন। (৩) কালো-বাজারের উন্নতির প্রতিবন্ধক আইনাবলীর উচ্ছেদ। (৪) ব্যবসা-ক্ষেত্রে অপকারী প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ।

উল্লিখিত উপায়গুলি বিশ্লেষণ করা যাক।

(১) কালো-বাজারকে কায়েমী রাখতে হ'লে যাবতীয় পণ্যের দাম বেঁধে দিতে হবে এবং এই মূল্য-নির্ধারণ পুরোপুরি আমদানি-নিরপেক্ষ হওয়াই চাই; যে সমস্ত পণ্যের চাহিদা খুব বেশি, অথচ আমদানি খুব কম, সেই সমস্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত থাকা চাই; নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যগুলির মূল্য সকলের আগেই নির্ধারিত করতে হবে। আমদানি-নিরপেক্ষ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কালো-বাজারের বিস্তৃতির পক্ষে অপরিহার্য। (২) খাদ্য-বণ্টন-প্রণালীকে বলা যেতে পারে কালো-বাজারের 'মা'। বণ্টিত দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা বর্জন করতে হবে; খাদ্যের সঙ্গে অখাদ্যের ভেদাভেদ দূর করতে হবে। সমূল্যে বিতরিত দ্রব্যের পরিমাণও রীতিমত হ্রাস করতে হবে। খাদ্য-বণ্টন-ব্যবস্থা মাত্র কয়েকটি বাছা বাছা শহরেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; আসল ভারত বাস করে যে গ্রামে, সেই সংখ্যাহীন গ্রামগুলিকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। (৩) কালো-বাজারের উচ্ছেদকল্পে বহুতর আইনী ও বেআইনী আদেশ জারি করা হয়েছে; কারা ও অর্থদণ্ডের অমূলক ভয়ও অনেক দেখানো হয়েছে। সকল লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতার ওপর যে কারবার চলছে, আইন সে কারবার কখনও ভেঙে দিতে পারে না; কালেভদ্রে সামান্য ক্ষতি হ'লেও বাজারের উন্নতি ও বিস্তৃতি অব্যাহতই আছে। অক্ষম আইনের কাঁটাগুলিকে কালো-বাজারের পথ থেকে সরাতে হবে এবং দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে আদর্শ কালো-বাজার স্থাপন করতে হবে। (৪) যুদ্ধোত্তরকালে অনেক ধনী ব্যবসায়ী

কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ক'রে নানা রকম পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করবে। সাধারণ বাজারগুলি যদি এই সব পণ্যে ভ'রে যায়, তা হ'লে কালো-বাজারকে এক দারুণ সঙ্কটে পড়তে হবে এবং ভবিষ্যতে হয়তো মাথা তুলে ওঠা সম্ভব হবে না। কালো-বাজারের শত্রু এইসব ধনী কারবারীদের যে কোন উপায়ে নিবৃত্ত করতে হবে, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনার ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ করতে হবে আর নূতন কলকারখানা স্থাপনের অনুমতিও দেওয়া চলবে না। এই উদ্দেশ্যে কালো-বাজারের সকল ব্যবসায়ীকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে ও একটি সংরক্ষণ-সমিতি গড়তে হবে। একদল প্রতিনিধিকে বাণিজ্য-সচিবের কাছে ধরনায় পাঠিয়ে সংরক্ষণমূলক আইনও বিধিবদ্ধ করিয়ে নিতে হবে।

উল্লিখিত উপায়গুলি ভালভাবে কাজে লাগাতে পারলে যুদ্ধোত্তর কালো-বাজারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

যারা হাড়-কৃপণ, তারা বলে, কালো-বাজারের সমস্ত জিনিসের দাম খুব বেশি। তিন টাকা মনের চাল পনেরো টাকায় কিনতে তাদের গায়ে লাগে না, যেহেতু ব্যবসাদার খোদ সরকার বাহাদুর। আর কালো-কারবারীদের দু-পয়সা বেশি দিতে গেলেই তাদের বুক ফেটে যায়। কালো-বাজারের নিয়ম-কানুন বিপদ-আপদ মনে রেখে জিনিসের দাম বেশি বলা মোটেই সঙ্গত হয় না। তা ছাড়া আবশ্যকীয় জিনিস যে যোগাল, তার ওপর একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে; সেই কৃতজ্ঞতার দামটাও জিনিসের দামের মধ্যে ধরা থাকে। তাই আপাতদৃষ্টিতে দাম বেশি মনে হ'লেও আসলে ন্যায্য দামই দিতে হয়।

দীর্ঘ ছ-বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অসীম চেষ্টায় যে প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে উঠেছে, তার কাছে আমরা অশেষ রকমে ঋণী। যুদ্ধকালীন জীবনের সফলতা বজায় রাখতে কালো-বাজার আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আজ যদি এই গড়া-প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে ফেলা হয়, আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটিকে আবার গ'ড়ে তুলতে আমাদের খুবই কষ্ট পেতে হবে; হয়তো এমন ভালভাবে গড়াই সম্ভবপর হবে না। এই বাজারে আমরা যে উপকার পেয়েছি, পাচ্ছি এবং পাব, তাতে ক'রে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহায়ক না হয়ে পারি না। তাই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় কালো-বাজারকে এমন একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে, যাতে তার সর্বতোমুখী বিস্তৃতি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হয়।

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্মকথা

২

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮। ৪৫ সংখ্যায় (৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯) বর্ষ শেষ হয়। কেবল মানহানির মকদ্দমার জন্য পত্রিকা কিছু দিন বন্ধ ছিল; ৩৯ সংখ্যা—১৮ই(১৯এ ?) অগ্রহায়ণ ১২৭৫ : ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখে প্রকাশিত হইবার পর ৪০ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮ পৌষ ১২৭৫ : ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখে। পত্রিকার ২য় খণ্ড আরম্ভ হয়—১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ তারিখে; শেষ হয় ৫২ সংখ্যায়, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ তারিখে।

পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত; সে-সকলের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। প্রথম বর্ষের পত্রিকায় সম্পাদক গত শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী সমাজের একটি চিত্র দিয়াছেন, সেটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

৭৫ বৎসর পূর্ব্বে। তখনকার ভদ্রলোক, আর এখনকার ভদ্রলোকে কত বিভিন্নতা! বাবু ও এয়ার লোকে তখন মস্তকে রাশিকৃত চুল রাখিতেন। তাহাকে বাবরি বলিত॥ এক্ষণে কার্ত্তিক ঠাকুরের মাথা সেইরূপ চুলে সজ্জীভূত করা হয়। ব্রাহ্মণ অথচ সৌখিন এরূপ বাবুরা চালিতা ফুলে বাবরি রাখিতেন। ব্রাহ্মণেরা কি অন্যান্য বিজ্ঞ ভদ্রলোকে সমুদায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া পশ্চাদ্দিকে শিখা রাখিতেন, কিন্তু আর সকলে একেবার মস্তক মুণ্ডন না করিয়া, চুল খাট করিয়া কাটিয়া কেবল মাত্র একটি লম্বা শিখা রাখিতেন। বাবুলোকে যৌবন কালে দন্তে মিশি দিতেন, সাদা দাঁতের প্রথা একেকালে প্রচলিত ছিল না। গলায় সকলেরি তুলসীর কি বাকসের মালা দিতে হইত। হিন্দুদিগের সহিত অন্যান্য জাতির প্রভেদ চিহ্ন এই মালা ছিল। ঘুনসী কি তাগি সকলেরি থাকিত। পিরান, চাপকান তখন কিছুই ছিল না, মেরজাই অনেক পরে ব্যবহার হয়, আর তাহার পরে পিরান চলিত হইয়াছে। চাদর কেহ ব্যবহার করিতেন না! ধুতি দোবজা নামক একত্র দুইখানা বস্ত্র বয়ন করা হইত। তাহার একখানা পরিধেয় আর একখানা চাদররূপে ব্যবহৃত হইত। পাদুকা ধনীলোকেই ব্যবহার করিতেন, অন্যান্য লোকে খালি পায়ে বেড়াইতেন, তবে

গৃহে খড়মের ও বাধার অত্যন্ত চলন ছিল। ব্রাহ্মণ কি অন্যান্য বিজ্ঞ লোক ব্যতীত সকলেই গোঁপ রাখিতেন, ও শ্মশ্রু মুণ্ডন সকলেই করিতেন।

স্ত্রীলোকে এক্ষণকার ন্যায় লম্বা কেশ রাখিতেন, ও খোপা বান্ধিবার সময় মোম দিয়া সিথি কাটিতেন। আমলা মেথি তখন আরো অধিক ব্যবহৃত হইত। সোণার গহনা বড় অধিক ছিল না, তবে কাহার স্বুবর্ণের ঢেরি, ঝুমকা ছিল। গরিব লোকে কর্ণে কড়ি দিত। হস্তে রূপার বাউটী, খাড়ু কংকন শংখ ও পায়ে বেঁকমল দেওয়া হইত। সমস্ত মুখ উলকির দ্বারা খচিত করা হইত। কখন কখন বা হস্তে হৃদয়ে ঐরূপ থাকিত। নাকের উপরে খয়েরের টিপ কি গুল পোকা দেওয়ার রীতি ছিল। দাঁতে মাজন, কোমরে ঘুনসী ও পরিধান অতিশয় মোটা শাড়ী, এই তখনকার স্ত্রীলোকের ঠিক অবয়ব।

আহারীয় দ্রব্য এখনও যাহা তখনও প্রায় তাহাই ছিল। গোম তখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া মেঠাই লুচি প্রভৃতি কেহ চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। মেঠাইর পরিবর্ত্তে পিষ্টক ব্যবহার হইত। যে দেশে খেজুরগাছ ছিল, সে দেশে সমস্ত শীতকালে প্রায় প্রত্যহই পিষ্টক প্রস্তুত হইত। দরিদ্র লোকে চাউলের গুঁড়া রস দিয়া পাক করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিত। নূতন ধানের ভাত উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া লোকে ভোজন করিত। বালাম কি সরু চাউল প্রায় পাওয়া যাইত না। ব্রাহ্মণ ভোজন প্রায় চিড়া, দধি ও গুড়ে সমাধা হইত। এক্ষণাপেক্ষা তখন মৎস্যের আমদানী অধিক ছিল। মাংস ভক্ষণ প্রায় ছিল না। জামাতা বাড়ী আইলে কি কোন উৎসব উপলক্ষে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থেরা ক্ষীরপুলি, ক্ষীরেলা, রাজভোগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। তখন কৃষিকার্য্য এরূপ বিস্তৃতরূপে প্রচলিত না থাকাতে, অপর্য্যাপ্তরূপে ঘাশ পাওয়া যাইত, ও দুগ্ধেরও অভাব ছিল না। বিশেষতঃ তখন দেশে গোবধ আদৌ হইত না।

ফলের মধ্যে পেঁপে তখন আদৌ এদেশে আইসে নাই। মর্ত্তমান কলা, বাতাবী নেবু, পেয়ারা ও আনারস তখন প্রায় পাওয়া যাইত না। এ সমুদয় বিলাতি ফল তখন সাধারণ্যে বড় প্রচলিত হয় নাই। মসুরির ডাইল তখন এদেশে বেশী পাওয়া যাইত না। মদ্যপান আদৌ প্রচলিত ছিল না। তবে দস্যু ও বেশ্যা, কোন২ তান্ত্রিক ও বৈদ্যেরা উহা ব্যবহার করিতেন। ধনী লোক মাত্রেই আহফেন ব্যবহার করিত। ও মদ্যের পরিবর্ত্তে সাধারণ্যে ভাঙ্গ প্রচলিত

ছিল। যে মদ্য ব্যবহার হইত তাহা ধান ও মাতাগুড় চুঁয়াইয়া প্রস্তুত হইত, দ্রাক্ষারস প্রচলিত ছিল না।

তখনকার লোকের দিনযাপনে ও এখনকার লোকের দিনযাপনে অনেক প্রভেদ। মকদ্দমা, চাকুরী, কোন প্রকার ব্যবসায় তখন ছিল না, কাজেই লোকে অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত। ক্রীড়ার মধ্যে দাবা ও পাশা, গোলক ধাঁধা ও দশ পঁচিশ লোকের দিন কাটানর উপায় ছিল। ইহা ব্যতীত ব্যায়াম চর্চ্চার আমোদ তখন সকলেই ভোগ করিতেন। তীর কি শড়কী চালান, লাঠীখেলা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি প্রায় সকলেই অভ্যাস করিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রি পাইলেই যুবকেরা জুটিয়া "চোর২" "গুটীখেলা" "ডুডু"খেলা করিত। মাছ ধরার বাতিক প্রায় সকলেরি ছিল।

আহারান্তে বিজ্ঞ স্ত্রী ও পুরুষে একত্র হইয়া রামায়ণ কি মহাভারত শ্রবণ করিতেন, আর একজন হাতের লেখা পুথি হইতে সুর করিয়া দুলিয়া দুলিয়া পাঠ করিতেন। রজনীতে কোন নিয়মিত স্থানে গ্রামস্থ তাবতে জুটিয়া গল্প করিতেন। এ গল্প এক্ষণকার গল্পের ন্যায় শুদ্ধ মকর্দ্দমা সংক্রান্ত নয়। পুরাণ হইতে উদ্ধৃত উপন্যাস, ডাকাতির গল্প, দেশের মধ্যের প্রধান প্রধান লোক যথা চৈতন্য, নন্দকুমার, রাণী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির চরিত আর ভূতের, বাঘের গল্প করা হইত। আর সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিতেন, গল্পের সময় সম্মুখে আগুন থাকিত, ও হুকা, কলিকা তামাক প্রস্তুত থাকিত।

কবির দল তখন প্রায় গ্রামে গ্রামে ছিল, আর এই কবি লইয়া গ্রামের মধ্যে দুই দল হইয়া পরস্পরে ঘোরতর গালির সংগ্রাম হইত। বালকেরা জুটিয়া পাড়ায় পাড়ায় সুর করিয়া কবিতা গাইয়া গাইয়া বেড়াইত, আর ইহার জন্য যে তণ্ডুল সংগ্রহ হইত তাহা দিয়া বনভোজন করিত। এ কবিতা সমুদায় বড় বড় লোকের নামে, হয় শ্লেষ না হয় প্রশংসা সূচক। নন্দকুমারের নামের এই একটী কবিতা আমরা শুনিয়াছি :—

"নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী
হেষ্টিং সাহেব এলো জান করিবার বারি,
রাজা নন্দকুমার রে তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলি রে।
খোপেতে কৌতর কান্দে খোহারেতে হাঁস
জোড় বাঙ্গালায় কান্দে সোণার গুলতি বাঁশ,

রাজা নন্দকুমার রে ইত্যাদি।
নন্দকুমারের মা কান্দে ঐ গাঙ্গের কুলে চেয়ে
আর কি আসিবে বাছা ঘোড়া ডিঙ্গে বেয়ে
রাজা নন্দকুমার রে ইত্যাদি।" ইত্যাদি

সময়ে সময়ে রামায়ণ, কথকথা, ঢপ, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইত বটে, কিন্তু কবিতেই দেশ সমেত লোক মত্ত ছিলেন। এক্ষণে আর কবি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। (২৭ আগষ্ট ১৮৬৮)

সম্পাদক বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন। সমাজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিধবা-বিবাহের ফল যে অশেষ কল্যাণকর হইবে, এই ধারণা তিনি পোষণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :—

বিধবা বিবাহ—আমাদের স্বদেশীয়গণকে আমরা গুটী কয়েক কথা বলিব। আমরা খ্রীষ্টিয়ান কি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহারদিগকে বলিতেছি না। আমরা বাঙ্গালি, গার্হস্থ্য সুখানুরত বাঙ্গালি, ও শুদ্ধ এই পরিচয় দিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা বলিতেছি। তাঁহাদের মনে ধরে গ্রহণ করিবেন, না হয় করিবেন না।

বিধবা বিবাহ নূতন কথা নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তর কথা বার্ত্তা তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আইন প্রচলিত হইয়াছে, ও অনেকে বিধবা বিবাহও করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দেশে যত জন বিধবা অদ্যাপি বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে তাহা ধরিতে গেলে কয়েকটী বিধবা আশ্রয় পাইয়াছে! মোটে না বলিলেও হয়। তবে আশার মধ্যে আমাদের এই আছে যে, বিধবা বিবাহের প্রকৃত বিরোধী কেহ নাই। মুখে যিনি যাহা বলুন, মনোগত প্রায় তাবতের ইচ্ছা ইহা প্রচলিত হয়।

বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র সিদ্ধ, ব্যবহার বিরুদ্ধ। ব্যবহার চিরকাল একরূপ থাকে না, সমুদায়ই ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিখান পূর্ব্বে কোন কালে ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভদ্রলোক মাত্রই বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিখাইয়া থাকেন। এই রূপেও বিধবা বিবাহ ক্রমে হিন্দু সমাজে প্রকাশ করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা এই আশার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে ক্ষান্ত থাকিতে পারি, কিন্তু উপস্থিত বিধবাগণের উপায় কি? সেই বিধবাগণের ভ্রাতা ভগ্নিগণের যে বিলম্ব সহ্য হয় না?

বিধবা বিবাহ করিলে জাতি কেন যায়, বুঝিতে পারি না। আমরা, এক জাতির অন্য জাতির সহিত বিবাহ হউক এ কথা বলি না। ঠিক এক্ষণে যেরূপ গোত্র কুল দেখা হইয়া থাকে সেইরূপ হউক, কেবল পাত্রীটি বিধবা হইবে। ব্রাহ্মণ কন্যার হাতে ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ কন্যার হাতে কায়স্থ অন্ন খাইবে ইহাতে কেন জাতি যাইবে? বেশ্যা গমনে, উপপত্নী রাখিলে, ব্যভিচারে আমাদের দেশে জাতি যায় না, ইহাতে জাতি গেলে কয়টী লোকের জাতি আছে? যে বিধবা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করুক। কিন্তু যাহারা দায় পড়িয়া ব্রহ্মচর্য্য করে, কি কুকর্ম্মে রত হইবার উদ্যোগী, তাহারদিগকে ধরিয়া বান্ধিয়া ব্রহ্মচর্য্য করার কি ফল? যখন বিধবারা সহমৃতা যাইত, তখন ছিল ভাল, কারণ ব্রহ্মচর্য্য করাপেক্ষা সহমরণ যাওয়া অনেক গুণে ভাল। এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই এ দেশীয় বিধবারা নিরুপায়ে পড়িয়াছে। যে দেশীয় স্ত্রীলোকে স্বামীর চিতার উপর আনন্দ সহকারে ও অবলীলাক্রমে ঝম্প প্রদান করিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিতে অপারগ হইয়াছে। এই সহস্র২ বিধবা নারীর দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া এদেশীয়গণের বুক পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আর তাঁহাদের এক্ষণে তত দুঃখ বোধ হয় না। কিন্তু তাঁহাদের বুক পাষাণ হইয়াছে বলিয়া, বিধবাদিগের দুঃখ কমে নাই। তাহাদের সেই আর্ত্তনাদ বরাবর সমান রহিয়াছে। লোকে টের পায় না, কিন্তু দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া তাহাদের হৃদয় অঙ্গার হইয়া যাইতেছে। তাহাদের চোখের জল তাহারা চোখে নিবারণ করে বলিয়া রক্ষা, নতুবা তাহারা যদি মনের দুঃখ বলিতে জানিত, তবে কত কঠিন পাষাণ গলিয়া যাইত।

আমাদের দেশে যতটি প্রকাশ্য বেশ্যা আছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন বিধবা, বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বেশ্যা হইয়াছে।* গ্রাম মাত্রেই কিছু কিছু কুকাণ্ড আছে।

* প্রথম বর্ষের ১ম সংখ্যা পত্রিকায় "বেশ্যাবৃত্তি" নামে একটি সম্পাদকীয় প্রস্তাব আছে। ইহার এক স্থলে আছে :—"কোন রোগের হেতু নির্ণয় না হইলে তাহার সুচিকিৎসা হয় না, সেইরূপ কোন দোষের মূল কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট না হইলে তাহার নিরাকরণের উপায়ও অবধারণ করা যায় না। কুলকামিনীগণ কি নিমিত্ত কুৎসিত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে? এ প্রশ্নের উত্তর বেশ্যারাই ভাল দিতে পারে, শুনা যাউক তাহারা কি বলে।....(* আমরা প্রায় দুই শত বেশ্যার পরিচয় লইয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নে গুটিকয়েক প্রকাশিত হইল।)" যে-সকল বেশ্যার বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই বিধবা অবস্থায় পদস্খলন হয়।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে কুকাণ্ডের হেতু বিধবারা। বৎসর বৎসর লাম্পট্য দোষের নিমিত্ত যতটা খুন হয় এত আর কিছুতেই নয়, কিন্তু লাম্পট্য দোষ এত প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বিধবাদিগের বিবাহ না দেওয়া। কত শত প্রধান লোকে ঘরের মধ্যে কত কুকাণ্ড দেখিতে বাধ্য হইতেছেন, কত প্রধান লোকের কন্যা, ভগ্নি প্রভৃতি বৈধব্য যন্ত্রণার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হওয়াতে তাহাদের বুকে বিষাক্ত শেল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কত প্রধান লোকে বাধ্য হইয়া আপনার কন্যা, কি ভগ্নির উপপতি আপনি যোগাইতেছেন—তবু সমাজের ভয়ে বিধবা বিবাহ দিতে পারেন না। শত শত ভ্রূণহত্যায় দেশ কলংকিত হইতেছে ও সেই ভ্রূণহত্যার সহকারিতা কত ভদ্রলোকের করিতে হইতেছে। এ সমুদায় কি মিথ্যা কথা, কবির বর্ণন? এরূপ চোখের উপর আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি না?…(৩০ ফাল্গুন ১২৭৫। ১১ মার্চ ১৮৬৯)

২৯ জুলাই ১৮৬৯ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় সম্পাদক এই সংবাদটি প্রকাশ করেন :—

"সংপ্রতি কলিকাতায় একটি বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের পুত্র বাবু **উপেন্দ্রনাথ দাস** পাত্র। উপেন্দ্র বাবু যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহার সমুচিত পুরস্কার তিনি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহার নিকট প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যশোহরবাসীদিগের একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় আছে। শ্রীনাথ বাবুর বাড়ী যশোরে (এক্ষণে কলিকাতায় বাড়ি করিয়াছেন) সুতরাং উপেন্দ্র বাবুকে আমরা যশোরে বলিলেও পারি।"

২৯ জুলাই ১৮৬৯ তারিখের পত্রিকায় মানহানির মকদ্দমা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমাদের লাইবেল মকর্দ্দমা।—একটী অত্যাচার আর মহারাণীর ১০ সহস্র সৈন্য নষ্ট হওয়া, একটী অত্যাচার আর মহারাণীর ১০ সহস্র শত্রু বৃদ্ধি হওয়া সমান। একটী অত্যাচারে সহস্র২ উপকার ধুইয়া যায়। একটী অত্যাচার হয় আর ব্রিটিশ রাজ্যের আয়ু শত বর্ষ কমিয়া যায়। কারণ কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিতে ও ক্রোধ ক্ষান্ত করিতে যত্ন করিতে হয়, একটী আস্তে আস্তে আইসে শীঘ্র যায়, আর একটী শীঘ্র আইসে আস্তে যায়।

সচরাচর অশুভ ঘটনার হেতু অপেক্ষা বক্তাই অধিক দোষী হইয়া থাকে, কিন্তু সেটী কি অন্যায় না? আমরা বলিলাম বলিয়া আমরা রাজবিদ্রোহী না যাহারা করেন তাঁহারা রাজবিদ্রোহী। কাহারা মহারাণীর পরম শত্রু কাহারাই বা মিত্র? অপার বুদ্ধিকৌশলে, বিস্তর যত্নে ও শোণিত পতনে, জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে ইংরাজেরা ভারতাধিকার করিয়া তাঁহাদের আধিপত্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। মফঃসলস্থ হাকিমেরা একটী একটী অত্যাচার করেন, আর এই ভিত্তিভূমিতে কুঠার মারেন। এই কুঠারের শব্দ সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্ট শুনিতে পান না বাঙ্গালিরা অনেক সময় শুনিয়া থাকেন, আর উভয়ে কেহ শুনুন না শুনুন, নিসর্গ সমুদায় শুনিয়া থাকেন। সেখানে ইহার একটাও অশ্রুত থাকে না।

এ পত্রিকা সংক্রান্ত লাইবেল মকর্দ্দমায় যে কিরূপ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অদ্য লিখিব। যৎকিঞ্চিৎ, বেশী নয়। এ পত্রিকায় [১৭শ সংখ্যা, ১২ জুন ১৮৬৮] একটী প্রস্তাব বাহির হয় তাহার মর্ম্ম এই। "দুই বৎসর গত হইল কোন এক জন নিম্নশ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেট বল পূর্ব্বক একটী স্ত্রী-লোককে আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু গ্রামস্থ লোকেরা একজুঠ হইয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। এ কথাটী দেশময় রাষ্ট্র বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম যদি গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করেন তবে আমরা কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি" আমরা ঝকমারি করিয়া এই কয়েকটী কথা লিখি, এই আমাদের অপরাধ। কাহার নাম ধাম নির্দ্দেশ নাই, কোনরূপ রাগদ্বেষ প্রকাশ নাই। এক্ষণে আমরা সর্ব্বসাধারণ্যে জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্টকেও জিজ্ঞাসা করি, কমিশনর চ্যাপমান সাহেবকেও জিজ্ঞাসা করি যে, ঐ প্রস্তাবটী লেখা কর্ত্তব্য হইয়াছিল না অকর্ত্তব্য হইয়াছিল। যাহারা এরূপ দেশময় রাষ্ট্র কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করে তাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে দণ্ড না পুরস্কার পাইবার যোগ্য? তার পরে। তখনকার মাজিষ্ট্রেট মনরো আমাদের কাছে একখানি পত্র লিখিয়া উহা এই বলিয়া শেষ করিলেন "আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই, কারণ আমি ইহার শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিব।" মনরো সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পত্র লিখিয়াই অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিলেন। এ কি কমিশনর চ্যাপমান সাহেবের আজ্ঞাক্রমে ক্ষান্ত দিলেন, কি কি কারণে ক্ষান্ত দিলেন তাহার বিন্দু বিসর্গও আমরা জানি না। কিছু অনুসন্ধান

হইয়াছিল বটে কিন্তু সে সমুদায় কাগজপত্র যাহার বিরুদ্ধে সেই অনুসন্ধান হইতেছিল অর্থাৎ সেই রাইট সাহেবকেই দেওয়া হইল। দিয়া, অপবাদের মকর্দ্দমা করিতে বলা হইল।

মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে চ্যাপমান সাহেব গল্পচ্ছলে আসামীদিগের জানাইলেন যে, রাইট সাহেব দোষী কি নির্দ্দোষী এক্ষণে জানা যাইবে, রাইট সাহেব দোষী হয় আসামীরা প্রমাণ করিয়া দিউক। কথা বলিবে যে পাত কাটিবে সে। গবর্ণমেণ্ট নিদ্রা গেলেন, আর হতভাগ্য আসামীরা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে গিয়া এই দায়ে ঠেকিয়া গেল? তাহাই হউক। ন্যায্যই হউক অন্যায্যই হউক দেশ সমেত লোকের মনের বিশ্বাস যে এই মকর্দ্দমায় সাহেবেরা সব একদিকে। এরূপ বিশ্বাস না হইবেই বা কেন, ইহার মধ্যে আসামীদিগের উপর যত ঝঞ্ঝাট গিয়াছিল তাহাতে সেই বিশ্বাস লোকের মনে ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। এমত অবস্থায় রাইট সাহেব দোষীই হউন আর নির্দ্দোষীই হউন, কোন বাঙ্গালীর সাহস হয় যে সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়? বিশেষতঃ যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহারা সকলেই ঝিনেদহ সাবডিবিসন নিবাসী। যখন আসামীরা রাইট সাহেবের বদলির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিল তাহা অগ্রাহ্য হইল, ইহা পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল যে অন্ততঃ কিছু কাল ঝিনুদহ পরিত্যাগ করিয়া রাইট সাহেব সদর সবডিবিসনের কায কর্ম্ম করুন। না তাহা হইবে না, রাইট সাহেব সেখানেই থাকিবেন অথচ তোমরা প্রমাণ করিয়া দিবা। গবর্ণমেণ্টের এ আবদার কুলান আসামীদিগের সাধ্য কি? আসামীরা ভাবিল যে আমরা অপরাধ করিয়াছি রাইট সাহেব এই বলিয়া আমাদের নামে লালিস করিয়াছেন, আমরা নির্দ্দোষী তাহাই প্রমাণ করিব, রাইট সাহেব দোষী নির্দ্দোষী তাহা প্রমাণ করিবার আমাদের প্রয়োজন কি? ইহাই ভাবিয়া তাহারা সাক্ষী ডাকিল না। সুতরাং রাইট সাহেব দোষী কি নির্দ্দোষী আদৌ সে বিষয় অদ্যাপি প্রমাণ হয় নাই।...

আসামীদিগের সহস্র২ মুদ্রা ব্যয় হইল, অথচ রাইট সাহেবের ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট লইলেন। রাইট সাহেবের সাক্ষীর পাথেয় ব্যয় গবর্ণমেণ্ট ১০০০ টাকা দিলেন, আসামীদিগের সাক্ষীর ব্যয় আসামীদিগকে দিতে লফোর্ড জজ হুকুম দিলেন, আসামীরা ৮ মাস পর্য্যন্ত যাবদিক কষ্ট পাইয়া পরে দুই জনে কাটকে গেল। রাইট সাহেব চাকুরী করিতে লাগিলেন, মকর্দ্দমা করিবার

নিমিত্ত ছুটী পাইলেন, আর মাঝের থিকে ক্ষতি পূরণ বলিয়া সহস্র টাকা পাইবার হুকুম বাহির করিলেন। এক্ষণে রাইট সাহেব ঝিনেদহ হইতে বদলী হইয়া মেদিনীপুরে গিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট কি এ বিষয় অনুসন্ধান করিবেন? আসামীদিগের জন্যে, রাইট সাহেবের জন্য, ও সমাজের জন্যে এটী করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত উচিত, কারণ আমরা দুঃখিত হইয়া ব্যক্ত করিতেছি যে এই মকর্দ্দমায় গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজদিগের সাধারণ্যে একটী ভয়ংকর অখ্যাতি হইয়াছে। এ অখ্যাতি এইরূপ একটী বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে যাইবে না। আর আমরা এই সময়ে সম্পাদকগণকে সানুনয়ে নিবেদিতেছি যে, তাঁহারা এই বিষয় লইয়া একটু আন্দোলন করুন। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক ও এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইলে এরূপ সমুদায় ঘটনা বাহির হইবে যে পৃথিবী সমেত লোক অবাক হইবেন।

* * *

'নীহারিকা'-রচয়িত্রী **প্রসন্নময়ী দেবীর** (প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা) কয়েকটি প্রাথমিক রচনা 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। বার বৎসর বয়সে লিখিত তাঁহার একটি রচনা ২৩ জুলাই ১৮৬৮ তারিখের পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

জগতের কিবা শোভা অতি মনোহর।
হেরিলে জুড়ায় তাপ প্রফুল্ল অন্তর॥
হতভাগ্য বঙ্গদেশে লইয়া জনন।
সতত থাকিতে হয় বন্দীর মতন॥
কোথা হে করুণাময় জগতের পতি!
তুমি বিনে বঙ্গবালার আর নাহি গতি।
কৃপা করি লওয়াইলে রাণীর সুমতি;
তাঁহার আদেশে হলো নানা স্থানে স্থিতি।
কত কত বিদ্যালয়,—গণা নাহি যায়।
ভারত মহিলাগণে দিতে জ্ঞানোদয়॥
সকলে মিলিয়া কর রাণীরে মিনতি।
হইলে তাঁহার কৃপা হইবে উন্নতি॥
যশোহর শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

১৮৬৮, ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে প্রসন্নময়ীর "বঙ্গভূমি" ও "প্রভাত" এবং ২৬ নবেম্বর তারিখের পত্রে "মনের প্রতি উপদেশ" কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসন্নময়ীর প্রাথমিক রচনাগুলি তাঁহার 'আধ আধ ভাষিণী' (ফেব্রুয়ারি ১৮৭০) পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র "সংবাদাবলি"-বিভাগ হইতে দুই-চারিটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

(ক) এদেশে আট জন স্ত্রীলোক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের নাম এই, পাবনা নিবাসী বামাসুন্দরী দেবী, শিবপুর নিবাসী কামিনীসুন্দরী দেবী, কলিকাতা নিবাসী কৈলাসবাসিনী গুপ্ত, কালিঘাট নিবাসী হরকুমারী দেবী, রাখালমণি গুপ্ত, বসন্তকুমারী দাসী, মার্থা সৌদামিনী দাসী ও কৃষ্ণকুমারী দাসী।… …

বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,** বাবু রসময় দত্তের পরিবারস্থ বাবু **রমেশচন্দ্র দত্ত** এবং…বাবু **বিহারিলাল গুপ্ত** সিবিল সরবিস্ পরীক্ষার নিমিত্ত বিলাতে যাত্রা করিয়াছেন। (১২ মার্চ ১৮৬৮)

(খ) আমরা দুঃখের সঙ্গে লিখিতেছি যে চগদিগির জমিদার বাবু **সারদাপ্রসাদ রায়**…অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন।……

অনরেবল বাবু **প্রসন্নকুমার ঠাকুর**কে মৃত রাজা সর রাধাকান্ত দেবের পদে ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতিরূপে বরণ করা হইয়াছে। (২৬ মার্চ ১৮৬৮)

(গ) বিগত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত বাবু **নবীনচন্দ্র সেন** বি, এ, সংপ্রতি এখানে ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। (৩০ জুলাই ১৮৬৮)

নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে ১০ জুন ১৮৬৯ তারিখের পত্রিকায় এই সম্পাদকীয় উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে :—"কি কারণে শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ, ডিপুটী মাজেষ্ট্রেট মাগুরা বদলি হইলেন আমরা জানি না। কিছু দিনের জন্য না একেবারে বদলি হইলেন, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু আমরা যশোরের প্রায় লোকের কাছেই জানিলাম, নবীন বাবুর বদলিতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। নবীন বাবু অল্পদিন মাত্র আসিয়াছেন, কিন্তু কাজকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এখানে থাকিলে দিন২ আরো সুবিচারক হইতে পারিতেন। ইঁহার স্থানে যিনি আসিয়াছেন তিনিও যেমন নূতন, নবীন বাবুও তাহাই।…"

বিদায়কালে কয়েক জন বন্ধু নবীনচন্দ্রকে একটি কবিতা—"প্রীতিহার" উপহার-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন; কবিতাটি পরবর্ত্তী ১ জুলাই তারিখের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঘ) গত ২৫শ সংখ্যক পত্রিকায় [৬ আগষ্ট ১৮৬৮] প্রেরিত স্তম্ভে নবীন বাবুর লিখিত মনরো সাহেবের প্রশংসা সূচক যে পদ্যটি প্রকাশিত হয়, তাহা প্রতিবাদ করিয়া অনেকে আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছে… । …

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন "এক বৎসরের মধ্যে পুরাপাড়া নিবাসী ৺ দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ৺ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং বজ্রযোগিনী নিবাসী আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ পারস্থ হোগলা নিবাসী ৺ গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম ও চিৎকরা নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়দিগর মৃত্যু সংবাদ লিখিয়া আমরা পাঠকগণকে শোকের অংশী করিয়াছি। সংপ্রতি নানা-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত পণ্ডিত পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয় জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া গঙ্গাযাত্রা করিয়াছেন। তিনি যে এবার রক্ষা পান এরূপ ভরসা নাই। নানা প্রকারেই বিক্রমপুরের বলক্ষয় হইতেছে ওরূপ লোক আর হওয়া সম্ভবপর নয়।" (২০ আগষ্ট ১৮৬৮)

(ঙ) আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মৃত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পৌত্র বাবু **গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর** পরলোক গমন করিয়াছেন॥ ওলাউঠা রোগে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে [১৬ মে]॥ ইহার ন্যায় সদালাপী ও অমায়িক ভাবাপন্ন যুবক অতি কম দেখা যায়। বড় মানুষের ছেলেদের যে সকল দোষ দেখা যায় ইহাতে তাহার কিছুই ছিল না॥ তাঁহার জমিদারস্থ প্রজাগণের হিতের নিমিত্ত তিনি সদা ব্যস্ত থাকিতেন॥ ইনি নিজে একখানি সংস্কৃত নাটক বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন॥ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ও তিনি মাঝে মাঝে লিখিতেন॥ অধুনা চৈত্র মেলার উন্নত্যর্থে তিনি বিস্তর উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন॥ চৈত্র মেলার তিনি অনারেরী সেক্রিটারী ছিলেন॥ ধর্ম্মভাবও ইঁহার অতি প্রবল ছিল। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি এই সংস্কৃত প্রার্থনাটি করেন॥

"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোস্মাহ মৃতং গময় আবিরা বীর্ম্মএধি॥ রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখংতেন মাংপাহি নিতং॥" (২৭ মে ১৮৬৯)

(চ) "বুধবারে সমস্ত দিন ও রাত্র ঝড় হওয়ায় আমাদের ছাপাখানার কাজ একেবারে বন্ধ থাকে। এই জন্য এবার তিন ফরমার বেশী আমরা ছাপাইয়া উঠিতে পারিলাম না।" (১০ জুন ১৮৬৯। ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬, বৃহস্পতিবার)

[কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যখন যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় এই প্রবল ঝড় হয়। তাঁহার 'আমার জীবনে' (২য় ভাগ, পৃ. ২৫, ৮০-৮১) যশোহরে সাইক্লোনের কথা আছে, কিন্তু কবে এই ঝড় হয়, তাহার কোন উল্লেখ নাই]

(ছ) **রাণী কাত্যায়নী** [লালা বাবুর পত্নী] উত্তম লেখা পড়া জানিতেন। প্রচলিত ৩।৪ খানি আইনে তাঁহার অধিকার ছিল। জমীদারী সংক্রান্ত পত্রাদির মুসাবিদা তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। অনেক উকীল তাহা দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। রাণীর বিদ্যানুরাগিতা ও সৎকার্য্য প্রবৃত্তি অতি প্রশংসনীয় ছিল। তিনি হুগলী কলেজে একটি প্রধান ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন; আজিও উহা তাঁহার স্মরণীয় নাম ধারণ করিতেছে। নানা স্থানে সাধারণের উপকারার্থ রথ্যা নির্ম্মাণ, সেতু বন্ধন, সরোবর খনন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অনেক বাঙ্গালা পাঠশালায় ও সংস্কৃত টোলে প্রচুর অর্থ সাহায্য দান করেন। অধিক কি, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে যে পুরুষ জমীদারগণ যাহা জানেন না অথবা জানিয়াও পালন করেন না কিম্বা সাধন করিতে একান্তই অক্ষম, অন্তঃপুর নিরুদ্ধা একটি মহিলা তাহা জানিতেন, তাহা করিতেন, এবং সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিতেন। নবপ্রবন্ধ। (১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯)

কয়েক জন বিশিষ্ট বঙ্গসন্তান সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র আলোচ্য সংখ্যাগুলিতে কিছু কিছু সংবাদ আছে। সেগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। এবারে ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষায় বাবু **আনন্দমোহন বসু** উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে ইনি ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক দুই হাজার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। আনন্দ বাবুর কলেজ কেরিয়ার অদ্ভুত। ইনি যে অবধি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন সেই অবধি বরাবর সর্ব্বপ্রথম হইয়া আসিয়াছেন। আর বৎসর গণিতে ইনি অনর পরীক্ষা দিয়াও সর্ব্ব প্রধান হন ও পরীক্ষকদিগের নিকট সাধুবাদ প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষার পর ইনি রিজ সাহেবের স্থানে এঞ্জিনিয়ারিং

কলেজে গণিতের অধ্যাপক হয়েন। এ বারে যে পরীক্ষা দিয়াছেন ইহাতে তিনি শতকরা ৭০ নম্বর রাখিয়াছেন। এত পরীক্ষা দিয়াও তাঁহার বয়ঃক্রম ২২ বৎসরের অধিক হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়া কর্ত্তব্য। সেখানে যাইয়া হয় এ দেশের রাজনৈতিক উন্নতি সাধনের যত্ন করুন কি বিজ্ঞান শাস্ত্রটী ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়া আসুন। আর যদি তাঁহার যাওয়া বিবেচনা হয়, তবে যেন একজন বহুদর্শী লোককে তাঁহার সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯)

২। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কলিকাতার বাবু **গোপাললাল ঠাকুরের** মৃত্যু হইয়াছে।...বাবু গোপাললাল ঠাকুরের মিষ্টভাষা, সদালাপ ও বিপুল বদান্যতা দ্বারা কলিকাতা বাসীগণ তাঁহার নিকট বিশিষ্ট রূপে ঋণী আছেন। স্বদেশের উপকারার্থে যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায়ই তাহার নিমিত্ত তিনি বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ কলিকাতায় দুঃখী কাঙ্গালীগণ তাঁহার বিয়োগে শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহার বৃদ্ধ মাতার যে পুত্রশোক সহ্য করিতে হইতেছে এটি প্রকৃত অতিশয় দুঃখের বিষয়। (৩ জুন ১৮৬৯)

৩। আমরা যৎপরনাস্তি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে "বেঙ্গালী"র সম্পাদক বাবু **গিরীশচন্দ্র ঘোষ** মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ কি কুগ্রহের দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে বলা যায় না। ক্রমে২ ইহার সমুদায় রত্নগুলি অন্তর্হিত হইতেছেন। ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের বিয়োগে দেশ তত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কিন্তু এক জন বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন স্বদেশানুরাগীর মৃত্যু হওয়া না দেশের মর্ম্ম ভেদ করা। বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না। নিজ বাহুবলে তিনি উচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাহার ন্যায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, ও স্বদেশানুরাগী অতি কম লোক দেখা যায়। রাইয়তদিগের তিনি প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। ইংরাজী সমাচার পত্রের সম্পাদকতা করিয়া ইহার জীবনের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। এদেশে অতি কম সমাচার পত্র আছে, যাহাতে তাহার কিছু না কিছু লেখা দৃষ্ট হয়। রাজনীতি ও মনোবিজ্ঞানে ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট, যাহার তুল্য পত্রিকা এদেশে এখন প্রায় দেখা যায় না, তিনিই প্রথম বাহির করেন। ইংরাজীতে কয়েক খানি পুস্তক ইনি রচনা

করিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল, রামদুলাল সরকারের জীবন চরিত্র সংকলন করিয়া অতি উৎকৃষ্ট এক খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি স্বর্গগত হইয়াছেন। (৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নি

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৪

একটা মাসিকপত্র টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল। মলাটের উপরই প্রকাণ্ড একটা সাবানের বিজ্ঞাপন। একটি নারী তার প্রস্ফুটিত যৌবনকে লীলায়িত ক'রে আবক্র ভঙ্গীতে ব'সে আছে। নীচে রবীন্দ্রনাথের দু লাইন কবিতা। অন্তরা কাগজটা হাতে ক'রে ছবিটার দিকে চেয়ে ব'সে ছিল চুপ ক'রে। চেয়ে

* গত সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পৃষ্ঠা হইতে ১ম সংখ্যা 'অবলাবান্ধব' নামক পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভূমিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন যে, পত্রিকাখানির ১ম সংখ্যার সঠিক প্রকাশকাল আমার জানা আছে কি না, কারণ কেহই না-কি উহা দিতে পারেন নাই। 'অবলা-বান্ধবে'র ১ম সংখ্যা না দেখিলেও, উহার প্রথম প্রকাশকাল যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ মে, তাহা সমসাময়িক সংবাদপত্র-পাঠে জানা যায়। পত্রিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ (৩১ মে ১৮৬৯) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :—

"অবলা বান্ধব।—এখানি পাক্ষিক পত্র। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ অবধি ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৪ টাকা। শ্রীযুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য। এই শ্লোকেই তাহার স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যথা :—

'সন্তুষ্টো ভার্য্যা ভর্ত্তা,
ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলেনিত্যং,
কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবহ।'

প্রথম সংখ্যার লেখাও মন্দ হয় নাই।"

ব'সে ছিল, দেখছিল না। যখন দেখলে, তখন সারা মন বিরক্তিতে ভ'রে উঠল। নারীদেহের এই মাংসপিণ্ডগুলোকে যে কোনও ওজুহাতে যখন তখন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে লজ্জাও ক'রে না! পুরুষদের হয়তো করে না, তারা ওই হয়তো লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখতে চায়, কিন্তু মেয়েদেরও কি করে না? করে না বোধ হয়। কই, এ বিষয়ে কোনও নারীর প্রতিবাদ তো চোখে পড়ে নি আজ পর্যন্ত! তারা বোধ হয় এর সমর্থনই করে। করাই স্বাভাবিক, ব্যবসাদার যেমন তার মাল বিজ্ঞাপিত করতে চায়;··· ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল অন্তরার। তাড়াতাড়ি মাসিকপত্রিকার পাতাগুলো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উলটে গেল একবার। আবার শেষ থেকে গোড়া পর্যন্ত। তারপর বিতৃষ্ণাভরে সরিয়ে রেখে দিলে সেটা। সদ্য-আসা মাসিকপত্রের মোড়কটা প'ড়ে ছিল সামনে, সেটাকে অকারণে কুচিকুচি করলে অনেকক্ষণ ধ'রে। প্রত্যেকটি কুচি পাকিয়ে পাকিয়ে লুফল খানিকক্ষণ। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারপর। চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিলে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ডান কানের দুলটা এখনও বেঁকে আছে একটু···স্যাকরাটা ঠিকমত জুড়তে পারে নি··· দুলটা কেন ছিঁড়েছিল অনিবার্যভাবে সে কথাটাও মনে পড়ল। কিন্তু সেটাকে সে আমল দিলে না কিছুতেই, জোর ক'রে সরিয়ে দিলে মন থেকে। ও কথা নয়, সে অন্য কথা ভাবতে চায়, অন্য কিছু, যা হোক কিছু। একটা কথা মনে পড়াতে সে বেঁচে গেল।

রামধন!

আজ্ঞে?

ভৃত্য রামধন দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হ'ল।

কই, বাজারের হিসেবটা দিলে না?

এই যে মা, নিন না। চার আনার আলু এনেছি, দু পয়সার সিম, আর আধ সের বেগুন তিন আনার···

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিতে লাগল অন্তরা প্রত্যেকটি জিনিসের দর ক'ষে, প্রত্যেকটি জিনিস ওজন ক'রে। অবাক হয়ে গেল রামধন। কোনদিন তো এ রকম করেন না, আজ হ'ল কি! তার আত্মসম্মান আহত হ'ল একটু, কিন্তু কি বলবে! পুলকিতও হ'ল, যখন হিসেবে কোন খুঁত ধরতে না পেরে বকশিশ পেলে চার আনা। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কাঠের টুকরোটাকে তুচ্ছ

জেনেও প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চায়, রামধন-প্রসঙ্গটাও তেমনই কিছুতে শেষ হতে দিতে চাইছিল না অন্তরা।

লাক্স সাবান বড় প্যাকেট পেলে না একেবারে? বাবুর নাম করেছিলে?

বাবুর নাম করলে ছোট প্যাকেটও পাওয়া যেত না মা। কোনও 'অপসরকে' কোন জিনিস দিতে চায় নাকি সহজে আজকাল! যেটুকু দেয় কারে প'ড়ে। আমাদের দেখলেই সরিয়ে ফেলে সব, বলে—বিক্রি হয়ে গেছে। হরিয়াকে দিয়ে কিনিয়েছি এটা···

হরিয়া স্থানীয় শশীবাবুর চাকর। শশীবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরকারী ডেপুটি নন। কথাটা ব'লেই রামধন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তখনই সামলে নিয়ে বললে, আমাদের বাবুকে তবু ভালবাসে অনেকে, তাই আমরা কিছু কিছু পাই। এস. ডি. ও. সাহেবের চাপরাসীকে দেখলে তো··· রামধন ভ্রূযুগল উত্তোলন ক'রে প্রকাশ করলে বাকিটা। এই সামান্য কথার ধাক্কায় অন্তরা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল যেখানে তা লক্ষ অপমানের তীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাকীর্ণ, বহু কাঁটা একসঙ্গে বিঁধল সর্বাঙ্গে। অন্তরার মুখের পেশী কিন্তু বিচলিত হ'ল না একটু। অমানুষিক শক্তিবলে কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক আবদারের সুর ঢেলে সে বললে, একটু গরম জল কর না তা হ'লে লক্ষ্মীটি। সিল্কের শাড়ি একখানা কাচতে হবে। রামধন চ'লে গেল গরম জল করতে। নূতন একটা সমস্যা সৃষ্ট হওয়াতে খুশি হ'ল অন্তরা। কোন্ শাড়িটা কাচতে হবে, সেটা নির্বাচন করা যাক এবার···একটাও ময়লা হয় নি তেমন···তবু বেছে বার করতে হবে একটা। সময় কাটবে।···

···ছোট একটি ঘর। জানলা নেই। ছোট ছোট দুটি ঘুলঘুলি। তাও লোহার জাল দেওয়া। কপাট বন্ধ। লোহার গরাদে দেওয়া মজবুত কপাট··· সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে,···অন্ধকার ঘরে একা চুপ ক'রে ব'সে আছে সে··· মুখময় গোঁফদাড়ি, পরনে কয়েদীর পোশাক। চোখ দুটো জ্বলছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা···

মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?—কথাগুলো উচ্চারণ ক'রেই অন্তরা আত্মস্থ হ'ল। শাড়ির স্তূপ সামনে রেখে কি ছবি সে দেখছিল এতক্ষণ! হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখলে কেন? জেলে মারধোর করছে নাকি? কই, কোন খবর তো পাই নি! তবে? স্পষ্ট দেখতে পেলে! কেমন ক'রে? ক্লেয়ারভয়েন্স? না,

ওসব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস নেই তার। শাড়ির দিকে মন দিতে চেষ্টা করলে আবার। দুরন্ত বন্যা! তবু বাঁধ দিতেই হবে একটা যেমন ক'রে হোক। ভেসে যেতে হবে তা না হ'লে অকূলে। ভয় করে···। সমাজের ভয় নয়, গুরুজনের ভয় নয়, কেমন একটা নামহীন ভয়। গ'ড়ে-তোলা পারিপার্শ্বিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে অভ্যস্ত জীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে কোথায় যাবে সে অনিশ্চিত কোন্ পথে! ভয় বাইরে নয়, নিজের মধ্যেই। নীড়বিলাসী অন্তরাত্মা ঝঞ্ঝার আভাস পেলেই পক্ষ সঙ্কুচিত ক'রে চোখ বুজে ব'সে থাকতে চায় নীড়ের মধ্যে, তা যত তুচ্ছই হোক না সে নীড়। নিশ্চিন্ত আরামই তার কাম্য। এমন কি পরাধীনতার আরামও। পরাধীনতার আরামও চায় সে? বেণী-দোলানো এক কিশোরী গ্রীবাভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠল মনের মধ্যে, কক্‌খনো নয়। অনাবিল স্বাধীনতায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে যে আরাম, তাই চাই আমি। সে স্বাধীনতা কোথায়, সে মনুষ্যত্বের অর্থ কি খুঁজে বার কর সেটা। ঝুটো জিনিস কখনও চাই নি, কখনও নেব না।···বেণী-দোলানো কিশোরীটির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অন্তরা। তার নিজেরই পূর্বরূপ···বয়ঃসন্ধির সেই অপরূপ ছবিটা, এখনও মরে নি নাকি···এখনও বেঁচে আছে অবুঝটা! কোন্ স্বপ্নলোকে? সহসা মনে হ'ল, ওই সত্য, স্বপ্নই সত্য, বাকি সব মিথ্যা। স্বাধীনতা কি···মনুষ্যত্ব কি?

অতীতের দিনগুলো এলোমেলোভাবে মনে পড়ল। মা বাবা ভাই বোন জামা-কাপড় ফ্রক-ব্লাউজ টেপ তেল চিরুনি স্নো বই-খাতা স্কুলমাস্টার-মাস্টারনী বান্ধব-বান্ধবী চিঠি প্রেম, এই সমস্তকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত সত্তা যে ছন্দে আবর্তিত হয়েছে, তা স্বাধীনতারই ছন্দ। নিজের মতে নিজের পছন্দ অনুসারে সব চেয়েছে সে। সব মানুষই তাই চায়। স্বাধীনতা মানেই মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব মানেই স্বাধীনতা। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি এটা। শৈশব থেকেই মানুষ পার হতে চায় গণ্ডি, লঙ্ঘন করতে চায় বাধা, অমান্য করতে চায় বারণ। এটা ক'রো না, ওখানে যেও না···অনাদি কাল থেকে হিতৈষী গুরুজনরা বারণ করছেন আর অনাদি কাল থেকে অবাধ্য শিশুরা তা অমান্য করছে। দুষ্কর্ম করতেও তার প্রবৃত্তি। সে ঠেকে শেখে, ঠেকে শেখবার স্বাধীনতাই সে চায়। তারই বাধা সে চূর্ণ করেছে যুগে যুগে, বাধা হিতকর হ'লেও চূর্ণ করেছে, চূর্ণ ক'রে মরেছে তবু থামে নি। পুরাতনকে

ওলটপালট ক'রে সে আধুনিক হতে চেয়েছে বারম্বার। মানবজাতির এই ইতিহাস। তার অসংখ্য কামনার অসংখ্য বাধাকে সে অপসারণ ক'রে চলেছে। প্রকৃতির নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা থাকে নি সে। শীতাতপের নির্যাতন সহ্য করে নি, গৃহ নির্মাণ করেছে, অগ্নি আবিষ্কার করেছে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে নিত্য নব উদ্ভাবনী-শক্তির সাহায্যে। দূরত্বের বাধা, সময়ের বাধাও সরিয়েছে সে। আকাশ-যান, বেতার-বার্তা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ···মানবসভ্যতার প্রগতি বাধা-অপসারণের ইতিহাস। মানুষ এও আবিষ্কার করেছে যে, আসল বন্ধন বাইরে নয়, কঠিনতম বন্ধন নিজেরই মধ্যে, ষড় রিপুর বন্ধন। তাও ছিন্ন ক'রে মানুষ মুক্ত হতে চেয়েছে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে। সে মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়, স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।···মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাধা কেন দেখলাম··· স্বাধীনতা-চিন্তার স্রোতকে ব্যাহত ক'রে প্রশ্নটা মনে জাগল আবার··· ।

মা, গরম জল হয়ে গেছে।

খুব বেশি গরম কর নি তো? চল, দেখি।

সাড়ম্বরে শাড়িটা সাবান দিয়ে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

···ভয় করে···হ্যাঁ, ভয় করে সত্যিই। কিন্তু ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও কি নেই? অতল গহ্বরটার দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলে···

···ঘূর্ণিপাকের তাণ্ডব চলেছে ওর তলায়···সমুদ্র-মন্থন···ওর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কৌতূহল হয় বইকি·· আত্মঘাতী কৌতূহল ··

পিপারমিণ্ট আছে আপনার কাছে?

মুন্সেফবাবুর দশ বছরের মেয়ে রেখা এসেছে। ছিমছাম পোশাক-পরা মেয়েটি। মাথার চুল বব করা। এর মধ্যেই চোখের দৃষ্টিতে বয়সের ছাপ লেগেছে। সরলতা নেই। কথায় কথায় চোখ নীচু করে···

পিপারমিণ্ট? আছে বোধ হয়। দাঁড়াও, দেখি।

সময় কাটাবার আর একটা ওজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল। তন্নতন্ন ক'রে আলমারিটা খুঁজলে নিপুণভাবে, তারপর এ কৌটো সে কৌটো, এ তাক সে তাক···অনেকক্ষণ পরে পাওয়া গেল শেষকালে।

বেশি নয়, একটুখানি আছে। ওমা, তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছে সেই থেকে?

মেয়েটি কিছু না ব'লে চোখ দুটি নীচু করলে শুধু।

াক হবে পিপারমিণ্ট?

মা পান দিয়ে খাবে।

মৃদুস্বরে কথা কটি ব'লে পিপারমিণ্ট নিয়ে চ'লে গেল মেয়েটি।

অন্তরা আর একবার বসল টেবিলে। আর একবার মাসিকপত্রখানা ওলটালে। গল্প পড়বার চেষ্টা করলে একটা। বিস্বাদ। কবিতা আরও বিস্বাদ।···উঠে দাঁড়াল। জানলার শার্শির একটা ফাটা কাচ জোড়া হয়েছিল পুরোনো চিঠি দিয়ে। সেইটে পড়ল খানিকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে।···দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার চিঠি···বিধবা···চেহারাটা মনে পড়ল···গোলগাল ফরসা বেঁটে হাসিখুশি মানুষটি। নিজের দুর্ভাগ্যকে অতি সহজভাবে মেনে নিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছেন সেটাকে, তা দিয়ে জীবনের স্রোতকে অবরুদ্ধ করেন নি·· আনন্দের ধারা বইছে অবারিতভাবে, চোখে মুখে কথায় হাসিতে উপচে পড়ছে তা, অথচ কোনও আতিশয্য নেই, সহজ সুন্দর আনন্দ। "জীবন" বলতে পাশ্চাত্য ধরনে আমরা যে পশুজীবন বুঝি, তার কোন আস্ফালন নেই। সেটা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এক বেলা আহার, পরনে খান, কখন ঘুমোন কখন জাগেন কেউ জানতে পারে না, মৈথুনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেই গেছে, ওকথা ভাবেও না বোধ হয়। আধুনিক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা মোটে নেই, একেবারে নিরক্ষর। আধুনিক মাপকাঠিতে এত ছোট যে মানুষটি, সে কিন্তু যেখানে থাকে সেখানটা পরিপূর্ণ ক'রে রাখে, সুরভিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আধুনিক-মনা অন্তরা দূর-সম্পর্কের এই দুর্গাদিদির সঙ্গ পাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল মনে মনে। দুর্গাদিদিকে কাছে পেলে সব কথা খুলে বলা যেত হয়তো, তিনি হয়তো বুঝতেন তার কথা। কোথায় আছেন এখন···অনেকদিন আগে এসেছিলেন একবার···ফিরে গিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, মানে লিখিয়েছিলেন পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে···উত্তর দেওয়া হয় নি।···কাটা কাচের সবটা জোড়া যায় নি কাগজ দিয়ে···চিড়-খাওয়া খানিকটা অংশে সূর্যালোকে রঙ ধরেছে···গৈরিক রেখার পাশে অতি-সরু রক্তের আভাস কাঁপছে থরথর ক'রে··· বাইরে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর··· ।

ভারতবর্ষের নির্ভীক আত্মার সত্য-রূপটি ওরই মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তর্কের বিষয় নয়, জানি। অনুভব করছি। হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-নেকটাই-পরা বিদেশী-বুলি-মুখস্থ-করা চাকরের দল ভারতে জন্মেছে ব'লেই কি ভারতীয় ওরা?

তিলক-ফোঁটা কেটে টিকি নামাবলী উড়িয়ে সংস্কৃত মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছে যে আর এক জাতীয় তোতাপাখির দল, তারাই কি ভারতীয়? জাতীয়তার অভিনয় ক'রে বিজাতীয় বুলি আওড়াচ্ছে যারা তারাই কি? কিছুই করছে না যারা—অন্ধ মূঢ় জনতার দল, যাদের দুঃখে আমরা অহরহ অভিভূত হয়ে বক্তৃতা-বিলাসের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি ক্রমাগত, ওই যে শতকরা নিরেনব্বই জন, যারা জন্মাচ্ছে আর মরছে ক্ষুধায় হাহাকার ক'রে লোভে লালায়িত হয়ে রোগে ভুগে ভুগে, যে কোন বক্তার বক্তৃতায় উত্তেজিত হচ্ছে, পুলিসের হুমকিতে পালাচ্ছে, কাবুলীর কাছে ধার করছে, তাড়িখানায় হাল্লা করছে, তারা সংখ্যাতে বেশি ব'লেই কি ভারতীয় নামের যোগ্য? না। আর্য বৌদ্ধ মুসলমান ক্রিশ্চান সভ্যতার বহুবিধ বিপর্যয়েও বিভ্রান্ত হয় নি যে ভারতীয় আত্মা, তার স্বরূপ কেবল ওরই মধ্যে ফুটেছে, অন্তরার মনে হ'ল। ওই চিড়-খাওয়া কাচের মধ্যে সূর্যালোকের মত, ভেঙেছে কিন্তু মরে নি, রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দ্রধনুতে। পুলিসের ব্যাটনে মাথা ফাটতে পারে, কিন্তু সেই ফাটল বেয়ে যা বেরুবে তা রক্ত নয় লাভা-স্রোত, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত নিরুদ্ধ উত্তাপ,… চিড়-খাওয়া কাচের ফাটলে ওই ক্ষীণ রক্তের আভাসে ভেসে ভেসে এসেছে, যেমন আসে জলন্ত সূর্যের বার্তা কোটি মাইল দূর থেকে।

গাড়িটা এসে কাছারিতে যখন দাঁড়াল, তখন অন্তরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে। আদালতের বিবিধ বৈচিত্র্য হঠাৎ যেন একটি ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হ'ল সহসা, তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সবিস্ময়ে নির্নিমেষে। নীরব প্রশ্নও একটা মূর্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টিতে—তুমি এখানে হঠাৎ? আস না তো কোনদিন!

চাকরকে দিয়ে গাড়ি ডাকিয়ে সে যখন তাতে চ'ড়ে বসেছিল, তখন সে যেন অন্য লোকে ছিল, এ অদ্ভুত আচরণের অস্বাভাবিকতা তখন চোখে পড়ে নি তার। গাড়ি ডাকিয়ে অবিলম্বে আদালত অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটাই বরং সঙ্গত মনে হয়েছিল তখন। ওই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও তো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এখন সহসা সে উপলব্ধি করলে, জবাবদিহি করতে হবে একটা। জবাবদিহি না করলে…কিন্তু কি বলবে! মিছে কথা বানিয়ে বলতে হবে একটা? কিন্তু কি বলবে…মাথায় কিছু এল না; অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে ব'সে রইল সে। যে ঘরটায় তার স্বামীর আদালত তার সামনে খুব ভিড়…।

"রামু মণ্ডল হাজির হো…"

চীৎকার ক'রে উঠল আরদালী।

বিচার হচ্ছে। তার স্বামী বিচারক।

তার সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। বহু দূরের বহু যুগ পরের অনাগত ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন…সেখানে তার বিচারক স্বামী নেই। অংশুমান? কই, সেও সেখানে নেই। জনতার মধ্যে নেই, নির্বাচিত সুধীদের মধ্যেও নেই। কোথায় সে…? বিরাট বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র একটা, কুচকুচে কালো জল, তার মধ্যে একটা লাল দ্বীপ…প্রবাল নয়, জমাট রক্ত…বহু যুগের প্রচুর রক্ত জ'মে কঠিন হয়ে গেছে কিন্তু কালো হয় নি, টকটকে লাল আছে এখনও। সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে অংশুমান একা…মৃত রক্তকণিকাদের জাগাতে চেষ্টা করছে, ভাবছে, তারা না জাগলে তো সবই বৃথা…।

এ কি, বউদি, আপনি এখানে?

নবীন উকিল একটি। ভাব হয়েছে ছেলেটির সঙ্গে কিছুদিন থেকে তার স্বামীর। কমিউনিজ্‌মে আস্থাবান, ভাল ব্রিজ-খেলোয়াড়, মিহি খোশামোদও করতে পারে।

বাজারে যাচ্ছি।

এত ঘুরে?

বীণাদের বাড়িও যাব।

ঠিক সময়ে মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়াতে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু আগেও মনে পড়ে নি যে, বীণাদের বাড়িটা কাছারির সামনেই। বীণারা সেদিন এসেছিল, গেলেও বেমানান হবে না। কিন্তু সে যাবে না। ওজুহাতটা খাড়া করতে পেরে স্বস্তি অনুভব করলে একটু।

বীণারা আজ কলকাতা গেছে সকালের ট্রেনে…

ও, তাই নাকি!

একটু ঝুঁকে গাড়োয়ানকে বললে, তবে বাজার চল।

গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, তখন দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ অনিবার্য প্রশ্নটা সে ক'রে বসল, আচ্ছা, জেলে নাকি মারধোর করছে?

আপনি কোথা থেকে শুনলেন?

কে যেন বলছিল।

খবর তা হ'লে র'টে গেছে। ওসব খবর কি চাপা থাকে কখনও?

সত্যি তা হ'লে?

উকিল মানুষ, কথায় কিছু বললেন না, কিন্তু মুচকি হাসিতে যা প্রকাশ করলেন তা কথার চেয়েও স্পষ্টতর। বন্দী হৃৎপিণ্ডটা অনেকক্ষণ থেকেই পঞ্জরকারায় মাথা কুটছিল, হঠাৎ সেটা স্তব্ধ হ'য়ে গেল ক্ষণিকের জন্য।

মফস্বল শহরের বন্ধুর পথে ধূলো উড়িয়ে চলেছে ছ্যাকড়া-গাড়িটা। অসাড় অবসন্ন দেহে ব'সে আছে অন্তরা। মন কিন্তু উড়ে চলেছে ঝ'ড়ো হাওয়ার মুখে হালকা মেঘের টুকরোর মত· অদৃষ্ট অতীত থেকে অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে···।

অনেকক্ষণ পরে সামনে এলোমেলো নানা জিনিসের স্তূপ দেখে বিস্মিত হ'ল সে একটু। এগুলো···তখনই মনে পড়ল, নিজেই সে কিনেছে এগুলো বাজারে ঘুরে ঘুরে। ফিতে, চিরুনি, তেল, সাবান, টফি, চায়ের পেয়ালা। খদ্দরের টুকরোটাও চোখে পড়ল। এ বাড়ির কেউ পড়বে না জেনেও এটা সে কিনেছে। ওই খদ্দরটুকুকেই বার বার তুলে সযত্নে পাট করতে লাগল সে। ওই খদ্দরের টুকরোর মধ্যেই তার স্পর্শ যেন সে খুঁজতে লাগল। ধরবার মত হাতের কাছে আর তো কিছু নেই ···

···অপরাহ্ণ। পড়ন্ত রোদের একফালি এসে ঢুকেছে জানলার ভিতর দিয়ে। পড়েছে তার কোলের উপর। জানলার ধারে চুপ ক'রে ব'সে আছে অন্তরা বাইরের দিকে চেয়ে। বড় একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে চিরকালই সে একা। জীবনে ভিড় জুটেছে, সঙ্গী জোটে নি কখনও। বিশাল সমুদ্রে তৈলকণিকার মত তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে সে কেবল, মিশ খায় নি। সারা জীবন তবু ভান করতে হচ্ছে। নিজের কাছেও। আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে লোকে দেখে একটি তারার ঠিক পাশেই আর একটি তারা।··· কিন্তু দুটি তারার মাঝে কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান। ঠিক পাশে কেউ নেই—শুধু শূন্যতা···

১৫

নীহার সেন ডেপুটি হয়েছে ব'লেই যে মত বদলেছে তা নয়। এখনও সে মনে-প্রাণে কমিউনিস্টই আছে। ক্যাপিটালিস্টদের অধীনে চাকরি নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। পেটের দায়ে, সংসারের চাপে। পারিপার্শ্বিককে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলই তো জীবনযাপনের বিজ্ঞান এবং আর্ট। জীবনটা যখন যুদ্ধ, তখন কখনও আক্রমণ, কখনও সন্ধি, কখনও আপোস, কখনও বিরোধ এ তো হবেই। উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হ'ল। উদ্দেশ্য তার ঠিক আছে। তা ছাড়া এখন··· ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সঙ্গে বিরোধিতার কোন হেতু নেই। ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটিশ এখন অ্যান্টিফাসিস্ট···চার্চিলকে হাত মেলাতে হয়েছে স্টালিনের সঙ্গে। হাত মিলিয়েছে যখন, তখন ঝগড়া নেই আর আপাতত। চাকরি নেওয়ারও কোন বাধা নেই। শুধু তাই নয়, ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসন-বিভাগে চাকরি নেওয়াটা প্রয়োজনও। আগস্ট ডিস্টার্ব্-বেন্সের অর্থ তো পরিষ্কার। ফাসিস্ট জাপানকে আমন্ত্রণ। সেটা যে মারাত্মক। এ মূঢ়তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে, সুতরাং যেমন ক'রে হোক। আপাতদৃষ্টিতে যতই রূঢ় হোক তার আচরণ, যতই কঠোর হোক সমালোচনা, (তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত সংকীর্ণদৃষ্টি স্বদেশভক্তদের ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের ধার ধারে না সে), দেশের মঙ্গলের জন্যই এসব দৃষ্টিকটু ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে হবে এখন··· রোগীর মঙ্গলের জন্য যেমন তার ফোড়াটায় ছুরি চালাতে হয়, তেমনই জনতার উপর গুলি চালানোই দরকার এখন জনতার মঙ্গলের জন্য। লোকে যাই বলুক, দেশের এ অবস্থায় স্যাবটেজ মারাত্মক, যেমন ক'রেই হোক দমন করতে হবে।

নীহারবাবু বাইরের ঘরে একা ব'সে ফাইল ক্লিয়ার করতে করতে চিন্তা করছিলেন। আজকাল যখনই একা থাকেন, এই চিন্তাটা তাঁকে পেয়ে বসে। প্রতিপক্ষ কেউ নেই, তবু মনে মনে তর্ক করতে হয়। একা পেলেই চিন্তাটা চুপিচুপি চোরের মত এসে মনের মধ্যে ঢোকে, তর্ক জুড়ে দেয়,···কিছুতেই এড়াতে পারে না।

দমন করতেই হবে যেমন ক'রে হোক।—আর একবার মনে মনে

আওড়ালেন নীহার সেন। আউড়েই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। দ্বিজেন চক্রবর্তীকে দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে।···লোকটা কতক্ষণ এখন বকবক করবে কে জানে! পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর, তা ছাড়া একসঙ্গে প'ড়েও ছিল কলেজে। সুতরাং তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না সহজে।

কি হচ্ছে? ফাইল ক্লিয়ার? তোমরা খাসা আছ! আমাদের যে কি দুর্দশা···

কি রকম?—একটু কৌতূহল প্রকাশ করতেই হ'ল নীহার সেনকে।

পরশু দিনকার ঘটনাটাই ধর না। একটা নতুন থানায় বদলি হয়েছি, চার্জ নিতে না নিতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জরুরি হুকুম—ওই এলাকায় মিলিটারি নিয়ে গিয়ে একটা গ্রাম খানাতল্লাসী করতে হবে। যারা রেল-লাইন উপড়েছিল, তারা নাকি সেখানে লুকিয়ে আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করবার উপায় নেই। স্টেশনে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সমস্ত ট্রেনখানাই মিলিটারি, মায় ড্রাইভার পর্যন্ত। কম্যাণ্ডিং অফিসারই তার মালিক, কোথায় কখন থামাতে হবে তা ড্রাইভারকে বলা আছে আগে থাকতে। তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হ'ল। বি. এ. পাস করেছি তো, ইংরেজীতে নেহাৎ কাঁচাও ছিলাম না, কিন্তু ভাই, তাদের একটি কথাও বুঝতে পারি না প্রথমে। ঘুচঘাচ ক'রে কি যে বলে, বোঝাই যায় না কিছু। কথা বলে আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচোয়। মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ি শুধু। কি আর করব? একটু পরে বুঝতে পারলাম, গাল দিচ্ছে—আমাদের দেশের লোককে গাল দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায়। সন অব এ বিচ, সন অব এ গান, নিগার্‌স, ব্যাস্টার্ড্‌স্, এই সব হ'ল মৃদুতম। এই চলল খানিকক্ষণ। অনবরত সিগারেট টানছে, মদ মারছে, বিস্কুট চিবুচ্ছে আর আমাদের গাল দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারবার পরও মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে যাই। উপায় কি? কোথায় ট্রেন থামাবে তা আমাকে বলবে না। যদিও আমি পুলিস তাদের স্বপক্ষে আছি, কিন্তু আমি কালা আদমী যে! আমাকে বিশ্বাস করবে কি ক'রে? একটা ম্যাপ খুলে নিজেই ঠিক করছে সব। কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা থেমে গেল হঠাৎ মাঠের মাঝখানে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, দু দিকে মাঠ। সায়েব বললে, এইখানে নাবতে হবে। বললাম, এখানে? এখানে নেবে কি হবে, এখানে রাস্তা কোথা? সায়েব বললে, মাঠ

ভেঙেই যাবে তারা। সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে হবে। ম্যাপ দেখে বললে, মাইল খানেক গেলেই নাকি সেই গ্রামে পৌঁছনো যায়। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি, কিচ্ছু চিনি না, কারও সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হয় নি। আমার ঈষৎ ইতস্তত ভাব দেখে সায়েব রূঢ়কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, গেট ডাউন, গেট ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লীড আস। নাবলাম, মানে নাবতে হ'ল। ভাগ্যে কাছে একটা টর্চ ছিল। তারই সাহায্যে কোন রকমে ছেঁচড়ে-মেচড়ে তার টপকে মাঠে গিয়ে পড়লাম। আল ধ'রে ধ'রে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, নালা রয়েছে একটা। সোল্‌জারগুলো গাড়ি থেকে নেবে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ। আমি নালার একটা সরু অংশ দেখে লাফিয়ে পার হয়ে গেলাম, তারপর চেঁচিয়ে বললাম, কাম অন দেন। মাঠের মধ্যে নাবল সবাই, বেয়নেট উঁচিয়ে আল ভেঙেই ছুটতে লাগল ব্যাটারা। কিন্তু টর্চ ছিল না ব্যাটাদের, নালাটা দেখতে পায় নি, হুড়মুড় ক'রে পড়ল এসে তার মধ্যে। কিন্তু কিছু কি গ্রাহ্য করে ব্যাটারা! জল কাদা ভেঙে দেখতে দেখতে এপারে এসে উঠল সব। আমি ততক্ষণ ভেবে চিন্তে উপায় বার ক'রে ফেলেছিলাম একটা, বুঝলে···

এতক্ষণে থামলেন দ্বিজেন চক্র। একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে থামেন না তিনি সহজে। এখনও থামতেন না, কিন্তু সিগারেট ধরাবার প্রয়োজন হয়েছিল। ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করা ছাড়া আর কোন উপায়ে বিরক্তি প্রকাশ করা নীহার সেনেরও সাধ্যাতীত, মার্জিতরুচি ভদ্রলোক তিনি। তাঁর কুঞ্চিত-ভ্রূ দ্বিজেনবাবু লক্ষ্যও করলেন না বোধ হয়। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলেন তিনি—

উপায় একটা বার ক'রে ফেলেছিলাম, বুঝলে। কাছেই একটা বাগান ছিল, সম্ভবত আমবাগানই। সাহেবকে বললাম, তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এই বাগানে একটু অপেক্ষা কর, আমি দু-একজন লোক যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি। আমি কালই এখানে বদলি হয়েছি, পথঘাট ভাল চিনি না, তা ছাড়া ভিতরের খবরটা প্রথমে একটু জানলে সুবিধেই হবে। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি লোক যোগাড় ক'রে আনি। সাহেব সার্‌প্রাইজ অ্যাটাক করতে ব্যস্ত, তার এ সন্দেহও হয়তো হ'ল যে আমি বোধ হয় আসামীদের সতর্ক করতে যাচ্ছি। অনেক কষ্টে তাকে বোঝালাম যে, আমরা সার্‌প্রাইজ

অ্যাটাকই করব, কিন্তু এলোপাতাড়ি অ্যাটাক করলে অনর্থক একটা প্যানিক হবে, কাজ হবে না, বিভীষণ একটা যোগাড় করতে যদি পারি সুবিধে হবে। অনেক কষ্টে রাজি হ'ল লোকটা। আমি তাদের সেখানে রেখে বিভীষণ যোগাড় করতে বেরুলাম। সোজা খানিকক্ষণ হাঁটবার পর রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, থানা কোন্ দিকে? থানার রাস্তাই জানা ছিল না আমার। সে একটা রাস্তা বাতলে দিয়েই স'রে পড়ল, খাকি পোশাক দেখে সে আর বেশিক্ষণ কাছে থাকা নিরাপদ মনে করলে না। প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে থানায় পৌছলাম। আমি ঠিক তার আগের দিন চার্জ নিয়েছি। যিনি আমার জায়গায় ছিলেন, তাঁর সেই দিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চ'লে যাবার কথা। গিয়ে দেখি, সবাই স্টেশনে গেছে তাঁকে সি-অফ করতে। থানা ভোঁ-ভাঁ। একটি লোক নেই। আমি ভেবেছিলাম, থানার কন্‌স্টেব্‌লদের সাহায্যে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু গিয়ে দেখি, জনপ্রাণী নেই। অনেক হাঁকাহাঁকির পর চৌকিদার বেরুল একটা। তাকেই সঙ্গে নিয়ে সেই গ্রামটার নাম ক'রে বললাম, চল্, ওই গ্রামেই 'রোঁদ' দেব আজ। তুই সঙ্গে থাক আমার। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। আবার মাইল দুই হণ্টন। গ্রামে পৌছে দেখি, একেবারে নিষুতি। কেউ জেগে নেই, এক কুকুরগুলো ছাড়া। তারাই ঘেউঘেউ ক'রে সম্বর্ধনা করলে এবং সর্বক্ষণ পিছনে লেগে রইল। চৌকিদারকে বললাম, ডেকে তোল্ একজন কাউকে। কাকে হুজুর? যাকে হোক। একটা কুঁড়েঘরের সামনে অনেক সোরগোল ক'রে একটা জীর্ণ-শীর্ণ লোককে টেনে তুললে সে। স্বয়ং দারোগা সাহেব দ্বারদেশে সমুপস্থিত শুনে লোকটা তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেল, তারপর উঠেই সেলাম ক'রে ফেললে একটা···

দ্বিজেন চক্রবর্তী হা-হা ক'রে হেসে উঠতেই নীহার সেন বুঝতে পারলেন, দ্বিজেন মদ খেয়েছেন। ভ্রূ আর একটু কুঞ্চিত হ'ল। দ্বিজেনের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। নীহার ভাবতে লাগলেন, আগে তো খেত না, ধরলে কবে?

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার শুরু করলেন দ্বিজেনবাবু, সেলাম ক'রে লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল ক'রে। তারপর বার দুই ঢোঁক গিলে সসঙ্কোচে বললে, হুজুর ডেকেছেন আমাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ, চল্ আমার সঙ্গে। চৌকিদারকে বললাম, তুমি থানায় যাও, আমি আসছি

একটু পরে। চৌকিদার থানার দিকে চ'লে গেল, আমি চলতে লাগলাম সেই আমবাগানের উদ্দেশ্যে। এবার পলাশীর আমবাগান নয়, জাফরগঞ্জের আম-বাগান। হা—হা—হা—

নেশাটা জ'মে এসেছিল দ্বিজেন চক্রবর্তীর। আবার একটা সিগারেট ধরালেন তিনি।

হন হন ক'রে চলতে লাগলাম। লোকটা কুকুরের মত পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। এত রাত্রে কোথায় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছি তাকে, তা জিজ্ঞেস করবার সাহস পর্যন্ত হ'ল না লোকটার। ভাগ্যে হয় নি···

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আপন মনেই হাসলেন একটু মুখ নীচু ক'রে।

বাগানের অন্ধকারে বীর ব্রিটিশ সৈন্যরা বেওনেট উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সারি সারি আমার প্রতীক্ষায়। সেখানে ঢুকে টর্চটা জ্বাললাম দপ ক'রে, বেয়নেট-গুলো চকচক ক'রে উঠল। ক্যাপ্টেন সাহেব এগিয়ে এলেন। তাকে চুপিচুপি বললাম, লোক পেয়েছি একজন। তারপর সেই লোকটার দিকে ফিরে বললাম, তুমি বাঁচতে চাও? ভয়ে কথা সরছিল না তার মুখে, হাত জোড় ক'রে থরথর ক'রে কাঁপছিল শুধু সে। ঠিক তার দুদিন আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মিলিটারি রেড হয়ে গেছে। লোক মারা গেছে, ঘর পুড়েছে, নারীধর্ষণ হয়েছে। যারা পালাবার পালিয়েছে। নিতান্ত অপারগ যারা, তারাই আছে এখনও। এ লোকটা, পরে শুনলাম, কালাজ্বররোগী। একে ফেলে পালিয়েছে সবাই। এর ছেলে কোথায় চাকরি করে, তার আশায় ভিটে আঁকড়ে প'ড়ে আছে ও। আমার "বাঁচতে চাও" প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে সে শুধু বললে, হুজুর মা-বাপ। আমি বললাম, দেখ বাপু, ওসব ব'লে কিছু লাভ নেই। যারা রেল-লাইন উপড়েছে তাদের ঘর দেখিয়ে দিতে হবে। যদি দাও বাঁচবে, তা না হ'লে মৃত্যু। গুলি ক'রে এরা মেরে ফেলবে তোমাকে, কারও কথা শুনবে না। আমি কিছুই জানি না।—করুণকণ্ঠে বললে লোকটা। তা হ'লে মর। লোকটা চুপ ক'রে রইল। অশিক্ষিত বোকা লোক কিনা, মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও চুপ ক'রে রইল। আমি শিক্ষিত এবং চালাক, বুদ্ধি বাতলে দিলাম। বললাম, ওরে ব্যাটা, যে কোনও ঘর দেখিয়ে দে না তা হ'লেই হবে, কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবি? ক্যাপ্টেন সাহেব অধীর হয়ে উঠছিলেন, আমাদের কথা

একবর্ণ বুঝতে পারছিলেন না, গজরাচ্ছিলেন আর হাত-ঘড়ি দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি হিরোয়িক কাণ্ড ক'রে বসলেন একটা। আচমকা লোকটার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিলেন ব্লাডি সোয়াইন ব'লে। লোকটা প'ড়ে গেল। তারপর উঠেই দৌড়। অন্ধকারে কোথায় সে স'রে পড়ল খুঁজে পেলাম না আর। টমিগুলোও অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। ক্যাপ্টেন সাহেব ক্ষেপে উঠল, মনে হ'ল, আমাকেই মেরে বসে বুঝি। বললাম, সাহেব, ঘাবড়াচ্ছ কেন? খবর যোগাড় ক'রে এনেছি, চল আমার সঙ্গে, এস। নিয়ে গেলাম। গিয়ে কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হ'ল। কয়েকটি বুড়ী আর রুগী ছাড়া গ্রামে আর কেউ নেই, সব পালিয়েছে। সশস্ত্র ব্রিটিশবাহিনী নিরস্ত্র হ'ল না তবু। রুগীগুলোকেই ঠ্যাঙাতে লাগল। মারের চোটে একটা ছোঁড়া রক্ত-বমি করতে শুরু করলে; শুনলাম, থাইসিস। একটা টমি একটা বুড়ীরই কেশাকর্ষণ করছে দেখলাম। অনেক কষ্টে থামাই তাদের, শেষকালে তারা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে সোনাদানা যা পেলে পকেটে পুরে ব্রিটিশ-প্রতাপের মর্যাদা রক্ষা করলে কতকটা। আর···

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুম হয়ে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ দ্বিজেনবাবু।

নীহার সেনের কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয় নি। মুখে ফুটেছিল মৃদু হাস্যরেখা। দ্বিজেনের সব কথা শুনছিলেন তিনি, কিন্তু বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছিল না। স্থির জলাশয়ের জল যেন। ঊর্মির চাঞ্চল্যও নেই। সূর্যের আলো, মেঘের ছায়া, উড়ন্ত পাখির প্রতিবিম্ব, নক্ষত্রের দীপালী, জ্যোৎস্নার সমারোহ সবই জলে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু জলের জলত্ব নাশ করতে পারে না। ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ হবার পরও জল জলই থাকে। নীহারের প্রসারিত চেতনার উপর তেমনই দ্বিজেন চক্রবর্তীর বর্ণনাটা পরিস্ফুট হ'ল, কিন্তু রেখাপাত করল না। অনুরূপ একটা ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠল বরং। তিনি নিজেই সে ঘটনার নায়ক। একটা গ্রামে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে গিয়েছিলেন। সে গ্রামে পোস্ট-অফিস থানা স্টেশন সব পুড়েছিল। ঘাটে একটা মালবোঝাই ফ্ল্যাট ছিল, সবাই লুট করেছিল সেটা। সুতরাং দশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা অন্যায় হয় নি কিছু। দ্বিজেনের কথা শুনতে শুনতে সেই সম্পর্কে কয়েকটা মুখচ্ছবি পর পর ফুটে উঠল মনে। প্রায়ই ফুটে ওঠে। ভদ্রলোক সব। ডাক্তার জমিদার ব্যবসাদার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বেয়নেট-ধারী মিলিটারি পরিবৃত

হয়ে সারিবদ্ধ ব'সে আছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। ভীত, অসহায়। লুটপাট তারা করে নি তা ঠিক, কিন্তু টাকা তাদের দিতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে। না দিলে সম্পত্তি নিলাম ক'রে নেওয়া হবে। গ্রাম্য ডাক্তারের দৃষ্টিটা মনে পড়ল, জ্বলছিল যেন। জমিদারের ম্যানেজারটা সেলাম ক'রে খোশামোদ করবার চেষ্টা করছিল। চতুর ব্যবসাদার ঘুষ দেবার প্রস্তাব করেছিল আকারে ইঙ্গিতে, বৃদ্ধ গৃহস্থ বেচারা কাঁদছিল। নীহার সেন কিন্তু টলেন নি। পাই পয়সা পর্যন্ত আদায় ক'রে এনেছিলেন। এসব ব্যাপারে টললে চলে না। শেষ লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তা হ'লে সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ছোটখাটো এমন অনেক কাজ করতে হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে অমহৎ, কিন্তু শেষ লক্ষ্যের মাপকাঠিতে যাচাই করলে ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় যা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় অবশেষে। লেনিন মানব-প্রেমিক ছিলেন, মনে মনে তিনি যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন তা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সেই সমাজকে বাস্তবে মূর্ত করতে গিয়ে নরহত্যায় পশ্চাৎপদ হন নি তিনি। হ'লে চলে না। লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ মানুষের ওইখানেই তফাত।···দ্বিজেন চক্রবর্তীর কথা শুনতে শুনতে এই সব মনে হচ্ছিল নীহার সেনের। বিচলিত হন নি তিনি, বিচলিত হন নি মোটেই, বিচলিত হতে চান না···সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, মনে মনে চীৎকার করছেন তিনি। তাঁর নিজেরই সত্তাটা যেন দু ভাগ হয়ে গেছে, এক ভাগ আর এক ভাগের সঙ্গে তর্ক করছে চীৎকার ক'রে। চমকে উঠে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তারপর দ্বিজেনের মুখের দিকে চাইলেন একবার আড়চোখে। মনে হ'ল, কিছু বলা উচিত।

কর্তব্য অনেক সময় কঠোর হয়ই, কি আর করা যাবে···

কর্তব্য? তাই নাকি! তোমার তো কর্তব্যপরায়ণ ব'লে নাম রটেছে খুব, তুমিও অনুভব করছ তা হ'লে! ভাল।

দ্বিজেনের মুখখানা হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল।

এইবার চুটিয়ে কর্তব্য করব ব্রাদার, বুঝলে। এতদিন ডালে ডালে ছিলাম, এবার পাতায় পাতায় বেড়াব। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া···কোথায় পড়েছিলাম বল তো, মরুক গে··· মোট কথা, চুটিয়ে কর্তব্য করব এবার। প্রমোশন হয়েছে, শুধু তাই নয়, আই. বি.তে বদলি হয়েছি। সেই সুখবরটাই

দিতে এসেছিলাম। উঠি এবার, ফাইল ক্লিয়ার কর তুমি। এক কাপ চা-ও তো অফার করলে না! মিসেস এখানেই তো? গান-টান শোনা যাচ্ছে না যে বড়?

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন দ্বিজেন চক্রবর্তী।

দ্বিজেনের কথায় নীহারের নূতন ক'রে আবার মনে পড়ল, সত্যি, অন্তরা আজকাল বড় বেশি রকম নীরব হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত গানে হাসিতে পূর্ণ ক'রে রাখত সে বাড়িটা। আজকাল সাড়াশব্দই পাওয়া যায় না। বাড়ির কোন্ কোণে প'ড়ে থাকে, বোঝাই যায় না যেন। নিয়মমত কর্তব্য সমাপন ক'রে যায় নিক্তির ওজনে, নিখুঁতভাবে। মনে হয়, ভিতরের মানুষটা কোথায় চ'লে গেছে। প'ড়ে আছে শুধু দেহ-যন্ত্রটা। যে অন্তরা একদিন তার প্রেমে পড়েছিল, সে অন্তরা কোথায়? সে যে অন্তর্হিত, এ কথা নীহারের অন্তর্যামী যে বুঝতে পারে নি, তা নয়। কিন্তু অন্তর্যামী ছাড়াও মানুষের মনে আর একজন থাকে, যে অন্তর্যামীর কথা বিশ্বাস করতে চায় না, প্রমাণ চায়। নীহারের মনের এই দ্বিতীয় সত্তাটি প্রমাণ সংগ্রহ করতেও ব্যগ্র নয়। অন্তর্যামী-আহরিত নিগূঢ় সত্যটি সে কেবল অবিশ্বাস করতে চায়। অন্তরা তাকে আর ভালবাসে না, এ কথা কিছুতেই মানতে চায় না সে। ইদানীং কিছুদিন থেকে যদিও সে বুঝতে পেরেছে যে, অন্তরার সবটা সে পায় নি, অন্তরার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কি আছে যা তার আয়ত্তাতীত, যা কিছুতেই তার নিজের নাগালের মধ্যে, তার বিশেষ অধিকারের মধ্যে ধরা দেয় না, ইচ্ছে ক'রে যে লুকিয়ে রেখেছে তা নয়, অন্তরা সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে দিয়েছে (নীহার এই বিশ্বাসটাকেই আঁকড়ে আছে প্রাণপণে), সে-ই—নীহারই তাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে পারে নি। সূর্যের কিরণ যেন। তারই বাতায়ন-পথে এসে তারই ঘর আলোকিত করেছে, তবু তার নয়। বেলা শেষ হ'লেই চ'লে যাবে, রাখা যাবে না কিছুতে। আকাশ যেমন দিগন্তরেখায় পৃথিবীকে স্পর্শ ক'রে আছে মনে হয়, অথচ কত দূরে···গাছের ফুলকে ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে, এমন কি 'বাটন্‌হোলে' গুঁজে রাখলেও ফুলের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করা যায় না যেমন কিছুতে, অন্তরা সম্বন্ধে এই ধরনের একটা বোধ তার হৃদয়কে আকুল ক'রে তোলে, যদিও ইদানীং কিন্তু অন্তরা তাকে আর ভালবাসে না, এ কথা স্পষ্টভাবে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না সে। অন্তর্যামীর মুচকি হাসির

উত্তরে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে জবাব দেয়—আমি ওকে সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছি না, সেটা আমার নিজেরই অক্ষমতা, ও তো নিজেকে উজাড় ক'রেই দিয়েছে!···এই সিদ্ধান্তে এসে শান্তি পেলেন নীহার সেন আবার। তাঁর অন্তরের সুনিভৃত অন্ধকার গুহায় বুভুক্ষু হিংস্র একটা পশুর দুই চক্ষে লেলিহান যে শিখাটা ধকধক ক'রে জ্বলছিল, তা যে আরও প্রখর হয়ে উঠল, নীহার সেন টের পেলেন না সেটা। পাবার কথাও নয়। গুহাটার সামনে মার্জিত চিন্তাধারার ঠাসবুনোনি পরদাখানা ঝুলছিল। সেটা তুলে ধ'রে আত্মবিশ্লেষণ করবার উৎসাহ ছিল না নবীন ডেপুটি নীহার সেনের। সময়ও ছিল না। সামনে স্তূপাকার ফাইল। ছুটির দিন, তবু ছুটি নেই। নীহার সেন ফাইলে মন দিলেন।

পাশের ঘরে অন্তরা শুয়ে ছিল। ঘুমুচ্ছিল না, চোখ বুজে প'ড়ে ছিল। তার আপাত-স্থৈর্যের অন্তরালে যে তুমুল আলোড়ন চলছিল, তার ঠিক স্বরূপটা নিজেও সে ঠিক করতে পারছিল না। ভয়, কৌতূহল, স্বাধীনতা-স্পৃহা, চক্ষুলজ্জা, বিদ্রোহ, সামাজিক কর্তব্য, নীহারের প্রতি মমতা এবং বিতৃষ্ণা—বহু বিচিত্র পরস্পর-বিরোধী মনোভাব প্রবল হৃদয়াবেগের ঘূর্ণিপাকে তার মনে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে এমন কিছুই সে খুঁজে পাচ্ছিল না যা নির্ভর-যোগ্য, যাকে অবলম্বন ক'রে সে দাঁড়াতে পারে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে। তুমুল ঝঞ্ঝার মাঝখানে অন্ধকারে সে ছুটে চলেছিল একটা সত্য আশ্রয়ের আশায়, যেখানে তার মন নির্ভয় হবে। যে ভিত্তির উপর সে তার স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করেছিল, তা ন'ড়ে উঠেছে। স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে পড়েছে। তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তবু? নিজেকে বারম্বার এই একই প্রশ্ন ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু থামতে পারছিল না। মনের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে একটা উত্তরও আসছিল, ঠিক উত্তর নয়, পালটা প্রশ্ন আর একটা—ত্যাগ করবে কোন্ ওজুহাতে, ত্যাগ ক'রে যাবেই বা কোথায়? এ প্রশ্ন কিন্তু তার প্রথম প্রশ্নকে নিরস্ত করতে পারছিল না কিছুতে। সঙ্গে সঙ্গে এও সে ভাবছিল, যা সে আপাতদৃষ্টিতে দেখছে, তাই কি নির্ভরযোগ্য? কিছুদিন আগে যে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সে নীহারের মধ্যেই জীবনের সঙ্গীকে আবিষ্কার করেছিল, সেই বিচার-বুদ্ধিটাই কি নির্ভরযোগ্য? স্বামীর কর্তব্যে নীহারের তো এতটুকু অবহেলা নেই, তাকে বিয়ে ক'রে বরং নিজের আত্মীয়সমাজে

সকলের বিরাগভাজন হয়েছে সে। কমিউনিস্ট হয়ে ক্যাপিটালিস্ট গভর্মেণ্টের অধীনে কেন সে চাকরি করছে, তার সপক্ষে নীহারের যুক্তির অভাব নেই, যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হ'লে শত্রুর সঙ্গেও আপোস করতে হয়। ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে কমিউনিজ্‌মের পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ অহরহ চলেছে, এটা তার অংশমাত্র। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখেই অধুনা ক্যাপিটালিজ্‌মের মিত্রের ভূমিকায় অবতরণ করতে হয়েছে কমিউনিস্টদের। এসব কথা নীহার বহু বার বলেছে, সে বহু বার শুনেছে। এর যৌক্তিকতাও সে অস্বীকার করতে পারে নি···বস্তুত এ নিয়ে তর্কই করে নি সে, নীহার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বার বার নিজের যুক্তিটা আস্ফালন করেছে তার কাছে কারণে-অকারণে। যুক্তির দিক দিয়ে এসব কথা অকাট্য হ'লেও অন্তরের অন্তস্তলে অযৌক্তিক কি যেন একটা বাষ্পাকারে উঠে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে যুক্তির স্পষ্টতাকে। মনে হচ্ছে, যুক্তিই কি জীবনের সব, জীবনযুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করাটাই মানব-জীবনের শেষ কথা, আর কিছু নেই? সামান্যতম পশুর আর বৃহত্তম মানুষের জীবন-দর্পণে কোন তফাত থাকবে না? এক-একবার এও মনে হচ্ছে, দাম্পত্যজীবনে রাজনীতিকে এত বড় স্থান দেওয়ার প্রয়োজন কি?···রাজনৈতিক মতবাদ থাকুক না বৈঠকখানার সুসজ্জিত সোফায় ব'সে···তর্কাতকি চলুক না সেখানে, তার আলোড়ন অন্তঃপুরের শান্তিকে বিঘ্নিত করবে কেন? তখনই আবার ভাবছে, আমার এ দাম্পত্যজীবন যে ওই সূক্ষ্ম মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত! সমাজের অন্তঃপুর আর এর অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল তফাত যে। এর সবটাই অন্তঃপুর, বৈঠকখানা নেই। সমাজ এ জীবন আমার ঘাড়ে জোর ক'রে চাপিয়ে দেয় নি, আমি নিজে জেনে এ জীবনকে বরণ করেছি। যে আদর্শ স্বপ্ন-জীবনকে মূর্ত করতে চেয়েছিলাম এত সাধ ক'রে, বাস্তবের এক আঘাতে সেই স্বপ্নটাই যদি চুরমার হয়ে গেল, তা হ'লে আর বাকি রইল কি? আদর্শ···স্বপ্ন···এই তো জীবনে চেয়েছি। কৌশল নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, রূপ নয়, অর্থ নয়, চেয়েছি মহত্ব, বীরত্ব, আত্মত্যাগ। ডেপুটি-গৃহিণী হয়ে সকলের উপহাসের খোরাক জোগানোই যদি এর পরিণতি হয়, তা হ'লে লক্ষপতি ধনীর দুলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী যে নাদুস-নুদুস ব্যক্তিটির সঙ্গে তার বাবা প্রথমে সম্বন্ধ করেছিলেন, তার গলায় মালা দিলেই তো হ'ত। জীবন-যুদ্ধের আইন অনুসারে বেশি সঙ্গত কাজই হ'ত। কিন্তু তা না ক'রে সে রূপকথালোকের রাজপুত্রকে

বরণ করেছিল···মিনুকে রাগের মাথায় অন্য কথা লিখলেও নীহার তার চক্ষে রূপকথালোকের রাজপুত্রই ছিল সেদিন, যে রাজপুত্র অসাধ্যসাধন করবে, ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলবে সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে। জীবন-যুদ্ধের কৌশলে সেই রাজপুত্র সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেল উপহাসাস্পদ কেরানীতে। হতে পারে না···কিছুতে হতে পারে না···

নীহার সেন তন্ময় হয়ে রায় লিখছিলেন। অসহায় কয়েকটা মুখ চোখের উপর ভাসছিল। অভাব···হ্যাঁ, অভাবই আসল কারণ, শুধু অর্থাভাব নয়, শিক্ষারও অভাব। লোকগুলোর চোখে পশুর দৃষ্টি, মানুষের নয়···ক্যাপিটালিস্ট সমাজের দুর্বল মানুষ-পশু। সুস্থ জীবন যাপন করবার সুযোগ পায় নি, চুরি করতে হয়েছে···তা ছাড়া···ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল নীহার সেনের। সত্যিই লোকগুলো চুরি করেছে কি?···একের পর এক এতগুলো লোক একবাক্যে যে কথা ব'লে গেল, উকিলের জেরায় টলল না, সে কথা বিশ্বাস করলে চুরি করেছে স্বীকার করতে হয়। এতগুলো লোকের কথা অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। কিন্তু মকদ্দমা দাঁড় করাবার জন্যে পুলিস যে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করে, এ তো জানা কথা। সেদিন একজন পুলিস-অফিসার বলছিলেন, নিছক সত্যের উপর নির্ভর করতে গেলে, কোন দোষীকে সাজা দেওয়া যায় না। আইনের এমনই গড়ন যে, দোষীকে সাজা দিতে হ'লেও সত্যের খানিকটা অপলাপ করতেই হবে। এই আইনের সহায়তা করেছে সে! সাক্ষীর উপর যেখানে সব নির্ভর করছে, এবং সে সাক্ষী পুলিস যখন নিজের খুশিমত তৈরি করতে পারে, তখন··· অসহায় লোকগুলোর নিষ্প্রাণ দুর্বল দৃষ্টি আবার মনে পড়ল তাঁর ···ওই দুর্বল দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসারও কিছু আভাস ছিল···সুযোগ পেলে ওরা প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না।···হয়তো ওরা নির্দোষ। কিন্তু 'হয়তো'র উপর নির্ভর করতে গেলে, কাজ চলে না। পৃথিবীতে সব আইনে ফাঁক আছে, সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ট্রেনে কলিশন হয় জেনেও আমরা ট্রেনে চড়ি। বিবেকের তীক্ষ্ণ চঞ্চু ঠোকর মেরে মনে যে ক্ষতটা করেছিল, এ কথা মনে হওয়াতে তাতে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল যেন। না, এতগুলো সাক্ষীকে অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই। ওদের পক্ষের উকিল তো কম জেরা করে নি। কলম চলতে লাগল নীহার সেনের। সব কটার সশ্রম

কারাদণ্ড দিয়ে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, যে ডেপুটি যত বেশি সাজা দিতে পারে, চাকরিতে তার নাকি তত বেশি উন্নতি হয়! দু-চারটে উদাহরণও মনে পড়ল। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। বাই জোভ, গুজব নয় তা হ'লে, সত্যিই সে রায় সাহেব হয়েছে। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি মনটা শ্রদ্ধাগদ্গদ হয়ে উঠল...পরমুহূর্তেই লজ্জা হ'ল...তখনই বিদ্রোহের সুর জাগল আবার...অনুপস্থিত প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য ক'রে মনে মনে আবৃত্তি করলেন... তুমি পাও নি, ঠাট্টা করছ তাই...আঙুর আর শিয়ালের গল্পটা মনে পড়ছে। এতে লজ্জারই বা কি আছে, আমি তো চাই নি, আমার যোগ্যতার জন্য যেচে ওরা দিয়েছে। ক্লাসে যেমন ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম। আর একটা সুখবরও ছিল চিঠিতে। সদরে বদলি হয়েছেন তিনি। অন্তরা খুশি হবে বোধ হয়। এই মফস্বলের বুনো আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছে বেচারা। তাই বোধ হয় অত মুষড়ে পড়েছে। আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ওর সঙ্গে গল্প করার পর্যন্ত সময় পাই না...ও বেচারের সময় কাটে কি ক'রে! একটা রেডিও সেট কিনতে হবে এবার। এখনই উঠে গিয়ে অন্তরাকে সুসংবাদটা দিয়ে আসবে কি না ভাবছিল, এমন সময় দরজাটা খুলে অন্তরা নিজেই এসে দাঁড়াল। চোখে অদ্ভুত রকম একটা উন্মুখ দৃষ্টি।

আমার একটা কথা রাখবে?

কি?

চাকরিটা ছেড়ে দাও তুমি। দেবে?...

মজ্জমান লোক যে আগ্রহভরে ভাসমান কাঠের টুকরোটাকে অপলকা জেনেও আঁকড়ে ধরতে যায়, সেই আগ্রহ ফুটে উঠল অন্তরার চোখের দৃষ্টিতে। আবেগভরে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

নীহার সেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

ক্রমশ

"বনফুল"

ফাঁদ

সাধ ক'রে কে আপন হাতে পরায় বাঁধন-দড়ি?
বারে বারে বাঁচান হরি, বারে বারেই মরি।
পাক খুলে যায় কপালগুণে—সে কাহিনী চোর কি শুনে,
লোভে লোভে সিঁধ কাটিয়া আবার ফাঁদে পড়ি।

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

৮

And this defendant further saith that the said Juggomohun Roy in his lifetime contracted several debts to a very considerable amount for which the said Juggomohun Roy was separately sued, as a person separated in pecuniary interests from the other surviving members of his family and that this defendant at any time or in any manner, hath not been required or compelled to pay and hath not in fact paid any or either of the debts which were so contracted by the said Juggomohun Roy subsequently to the partition and separation as aforesaid and this defendant further saith that in or about the year of Christ one thousand eight hundred and one the said Juggomohuu Roy as the exclusive proprietor of a certain Talook called Hurrirampore situate in pergunnah Chetooa in the district of Midnapore and which in and by the said intrument of partition had been allotted as part of the share of the said Juggomohun Roy was unable to pay a certain arrear of revenue then due to the Government of Fort William in consequence whereof the said Talook last mentioned was sold by the Collector for the time being of the said district of Midnapore and that in as much as the sale of the said Talook last mentioned did not produce a sufficient sum to satisfy the said arrear of revenue the said Jnggomohun Roy was thereupon imprisoned in the goal of Dewanny Addawlot of Midnapore for the balance which remained due to the said Government amounting to the sum of Four thousand four hundred and fifty eight Sicca Rupees or thereabouts and the said Juggomohun Roy continued to be so imprisoned in the said goal as a debtor for the last mentioned sum during a period of two years and an half or thereabouts And this defendant saith that during the period while the said Juggomohun Roy continued to be so imprisoned as aforesaid and although the said Juggomohun Roy corresponded in writing with this defendant he did not claim or pretend to be entitled to any share or proportion of the Talooks or other real property which were then in the possession of this defendant or to any share or interest in any personal property which was then in the hands or possession of this defendant but that on the contrary thereof the said Juggomohun Roy after suffering his long imprisonment as aforesaid addressed or caused to be addressed some document in writing to the Collector for the time being of the said district of Midnapore therein declared that he the said Juggomohun Roy was in such distressed circums-

tances, that he the said Juggomohun Roy was not able to pay more than the sum of One thousand Sicca Rupees on account of the said balance so due to the said Government and for which he was so imprisoned as aforesaid at one time or payment and proposing to pay the residue of the said balance by thirty four monthly instalments and this defendant further saith, that he hath been informed and believes and hopes to prove, that the said Juggomohun Roy about fifteen years after the said partition and separation as aforesaid absolutely sold certain immoveable property as and for his own separate and exclusive property and that the said Juggomohun Roy after the said partition and separation as aforesaid and without the privity or assent of this defendant or of the said Ramcaunt Roy mortgaged a considerable part of the property which had been allotted to him the said Juggomohun Roy in and by the said instrument of partition together with considerable part of the immoveable property which he the said Juggomohun Roy had acquired subsequently to the said partition and separation as aforesaid and this defendant further saith that the said Juggomohun Roy sometime in or about the month of Falgoon in the Bengal year one thousand two hundred and eleven answering to the month of February in the year of Christ one thousand eight hundred and four borrowed from this defendant the sum of Sicca Rupees one thousand and executed to this defendant an instrument in writing in the Bengal language and character for securing to this defendant the repayment of the sum last mentioned and this defendant lastly saith that the said instrument of partition so executed and registered as aforesaid hath not at any time been cancelled or revoked and that the same as this defendant hath been advised and believes is still valid and effectual according to the laws of the Hindoos, to bar the said Complainant obtaining any partition or account of property which this defendant hath derived under or by virtue of such instrument or which this defendant hath acquired subsequently to the date of such instrument and this defendant humbly craves all the benefit and advantage in law to which he is entitled in virtue of the said instrument of partition in the same manner as if this defendant had formally pleaded the same in Bar to the relief discovery and partition respectively sought by the Complainants Bill of Complaint and this defendant lastly submits to this Honourable Court that the facts and circumstances hereinbefore in that behalf mentioned respectively shew and prove that at any time subsequently to the partition and separation aforesaid, the said Ramcaunt Roy, Juggomohun Roy and this defendant did not reunite their pecuniary interests or in any manner agree to form or in fact form an undivided Hindoo family in the

manner in that behalf in the Complainants Bill of Complaint alleged and this defendant denies all and all manner unlawful combination and confederacy in and by the said bill charged without that that there is any other matter cause or thing in the Complainants said Bill of Complaint contained material or effectual in the law for this defendant to make answer unto and not herein and hereby well and sufficiently answered avoided traversed or denied is true to the knowledge and belief of this defendant all which matters and things this defendant is ready and willing to aver maintain and prove as this Honourable Court shall direct and humbly prays to be hence dismissed with his reasonable costs and charges in the law in this behalf most wrongfully sustained.

B. Turner
Defendant's Atty. Rammohun Roy H. Compton

This answer was taken and the defendant Rammohun Roy sworn to the truth thereof according to his faith this fourth day of October one thousand eight hundred and seventeen.

E. H. East

The defendant in addition to the ordinary mode of swearing for a person of his caste and condition held in his hands at the time the Vedant.

E. H. E.

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

গাড়ি চলেছে। দুই লম্বা বেঞ্চি ও দুটো বাংকওয়ালা ছোট্ট সরু কামরা। ধারে একটা পায়খানা, তা থেকে তীব্র গন্ধ ছুটছে—গাড়ি ছুটলে একটু কম থাকে, কিন্তু থামলে আর টেঁকা যায় না। পরিতোষ একটা বেঞ্চে পা থেকে মাথা অবধি র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে, তার পায়ের কাছে বড়কর্তার সেই দুটো অনুচর পাশাপাশি ব'সে আছে। আমি সামনের বেঞ্চিটায় বাইরের দিকের জানলার ধারে ব'সে। পকেটে দুখানা হাওড়ার টিকিট—সংসারে সেই মাত্র সম্বল। মনের মধ্যে বর্তমান ছাড়া আর চিন্তা নেই। গাড়ি চলেছে।

গাড়ি চলেছে—গরুর গাড়ির চালে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, দশ-পনেরো মিনিট অন্তর একটা ক'রে স্টেশনে থামে। থামে তো থেমেই যায়—মেরে না তাড়ালে এগুতে চায় না এমন অবস্থা।

ঘণ্টা দেড় কি দুই বাদে বড়কর্তার একজন অনুচর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কি খাস কলকাতায় ?

বললুম, হ্যাঁ, খাস কলকাতায়।

কলকাতার কোন্ জায়গায় ?

মেছুয়াবাজারে।

লোকটা আর কোনও কথা না বলে চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ গাড়ি কখন গিয়ে কলকাতায় পৌঁছবে ?

সে বললে, আজ সারাদিন যাবে, সারারাত যাবে, কাল বিকেলে পৌঁছবে, পাসিঞ্জার গাড়ি কিনা, কিছু ঢিমা চলে।

আমি আবার প্রশ্ন করলুম, তোমরা কলকাতায় যাবে নাকি ?

লোকটা আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সলজ্জভাবে এক রহস্যময় মুচকি হাসি হেসে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে। হনুমানের মতন সেই মুখে ওই হাসি দেখে ইচ্ছে হতে লাগল, চোয়ালে একটি 'নক্ আউট' ঝেড়ে বদনটি একেবারে বিগড়ে দিই। কিন্তু হায়! মানুষ অবস্থার দাস। চুপ ক'রে ব'সে থেকে সেই নীরব অভিনয় সহ্য করতে লাগলুম। বেশ বুঝতে পারলুম, বড়কর্তা পাহারাস্বরূপ এদের পাঠিয়েছে আমাদের সঙ্গে। মনে মনে হিসাব করতে লাগলুম, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার যদি লোক দুটোকে আমাদের আস্তানায় জিম্মে করতে পারি, তা হ'লে আমাদের ওপরে এই অত্যাচারের শোধ তুলব।

লোকটাকে খুব মিষ্টি ক'রে বললুম, কলকাতায় আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে চল। কিছুদিন থেকে মৌজ ক'রে আবার চ'লে আসবে, কোন খরচ লাগবে না তোমাদের।

লোকটা আমার কথা শুনে আবার সেই রকম রহস্যময় হাসি হেসে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

গাড়ি ছুটতে লাগল।

আরও কয়েকটা স্টেশন পার হ'য়ে যাবার পর আমিও পরিতোষের মতন আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম, গাড়ির দোলানিতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম টেরও পাই নি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না। ঘুম ভেঙে দেখি, বেলা অনেকখানি গড়িয়ে

গিয়েছে। উঠে দেখলুম, আমাদের প্রহরী দুজন কোথায় নেমে গিয়েছে, কামরার দুই বেঞ্চিতে আমরা দুজন শব্দ ও গতির তরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছি।

পরিতোষ তখনও সেই ভাবে শুয়ে। বাইরে রোদের ঝাঁজ একেবারে ক'মে গিয়েছে। ব'সে থাকতে থাকতে বেশ শীত করতে লাগল, মনে হ'ল, যেন একটু জ্বরও এসেছে, বেঞ্চির ওপরে পা দুটো গুটিয়ে বেশ ক'রে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসলুম।

ঘুমিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম। জাগা মাত্র আবার চিন্তা শুরু হয়ে গেল। মনে হ'তে লাগল, এমন ঘটনাবহুল, এমন বিচিত্র দিন আমার জীবনে আর আসে নি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি ভাগ্য পরিবর্তন পৃথিবীর কজনের হয়েছে তা জানি না। সেই ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে একে একে সমস্ত ঘটনা মনের মধ্যে এসে উদয় হতে লাগল। বয়স অল্প ছিল বটে, কিন্তু সেই বয়সেই অভিজ্ঞতার অশ্রুধারায় আমার জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অভিমান নেই ; কার ওপর অভিমান করব, কতবার অভিমান করব! মনে মনে শুধু বলতে লাগলুম, হে আমার ভাগ্যবিধাতা! এই যদি তোমার তোমার মনে ছিল, তবে এমন রামধনু কেন রচেছিলে আমার ভাগ্যাকাশে!

রেলগাড়ি চলেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি হ'লেও স্থিরভাবে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে সেই ফেলে-আসা জীবন-আবর্তের পানে।

বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম। বেহারের রুক্ষ জমি, ঘাস কিংবা শস্য নেই। কোন স্টেশনের কাছাকাছি এলে দেখতে পাওয়া যায়, পল্লীবালারা সারে সারে মাথায় জলভরা গাগরী নিয়ে দল বেঁধে চলেছে, সুন্দর সে দৃশ্য! কোথাও বা নীচু কুয়ো থেকে বলদের সাহায্যে ওপরে জল তোলা হচ্ছে, কলকাতাবাসীর কাছে সে দৃশ্য অভিনব।

সূর্য ক্রমেই পশ্চিমের গভীরে ঢ'লে পড়তে লাগল, স্টেশনগুলো ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগল জনবিরল। কোন কোন স্টেশনে একেবারেই লোক নেই ; শুধু একটানা করুণ সুর মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, রোটি গো-স্ত।

খিদেয় পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে, কিন্তু একটি পয়সা কাছে নেই যে কিছু খাই। কাশীতে আসার টিকিট করবার সময় কিছু খুচরো পাওয়া গিয়েছিল, আনা সাতেক হবে। কিন্তু সেগুলো পরিতোষের কাছে আছে, না ওরা কেড়ে

নিয়েছে, তা কিছুই মনে নেই। প্রহারের চোটে লোকে বাপের নামই ভুলে যায়, পয়সার হিসাব তো দূরের কথা!

আরও কয়েকটা স্টেশন পার হবার পর পরিতোষ ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইল। দেখলুম, তার মুখখানা এমন ফুলেছে যে তাকে আর চিনতে পারা যায় না। চোখ দুটো, এমন কি তার অস্বাভাবিক লম্বা নাকটা পর্যন্ত কোথায় ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। কিছুক্ষণ সেই রকম বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কুতকুত ক'রে চেয়ে থেকে সে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বললুম, কাঁদছিস কেন ভাই, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

সে একবার দুবার ঘাড় নেড়ে বললে, তোর কি হয়েছে?

কি হয়েছে রে?

নাকটা যে ভেঙে গেছে!

অ্যাঁ!—ব'লে নাকে হাত দিয়ে দেখি, নাক অদৃশ্য। দুই গাল আর নাক একেবারে সমভূমি হয়ে গেছে। সকাল থেকেই নাকের কাছে একটা ভার ও অস্বস্তিকর বেদনা অনুভব করছিলুম বটে, কিন্তু তিনি যে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন তা কল্পনাও করতে পারি নি। ভাগ্যে কাছে আয়না ছিল না!

পরিতোষকে আর তার মুখের অবস্থার কথা বললুম না। পকেট থেকে একটা ভাঙা বিড়ি বার ক'রে ধরিয়ে তাকে দিতেই সে আমার নাকের শোক ভুলে গেল।

আবার পরামর্শ শুরু হ'ল। অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর স্থির করা গেল যে, ভাগ্যের কাছে এত সহজে হার মানা হবে না। তার ওপরে কাল এই হাঁড়িমুখ নিয়ে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'লে তারাই বা বলবে কি? ঠিক করা গেল, একটা স্টেশনে নেমে প'ড়ে আবার একবার ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক!

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, আংটিটা আছে তো?

এতক্ষণ আংটির কথা একেবারেই মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি কাছা খুলে দেখলুম, সেটা তখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে নি।

পরিতোষ বললে, বড্ড খিদে পেয়েছে।

বললুম, তোর কাছে খুচরো কিছু আছে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ।—ব'লেই সে পকেট হাতড়ে একটা আধুলি, তিনটে পয়সা ও একটা সিকি বার করলে।

ঠিক হ'ল, আনা চারেকের রোটি-গোস্ত কিনলে দুজনের পেট ভ'রে যাবে।

বাইরে রোদ প'ড়ে গেল। শীতের ম্লান গোধূলি আমাদের আশা-প্রদীপ-শিখার চতুর্দিকে ধীরে ধীরে জমাট হয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। শোন নদীর লম্বা পোল পার হয়ে আরও কয়েকটা ছোটখাট স্টেশন পেরিয়ে আমাদের ট্রেন একটা বড়গোছের প্ল্যাট্‌ফর্মে এসে দাঁড়াল। বড় প্ল্যাট্‌ফর্ম মানে লম্বা-চওড়ায় বড়, বাঁধানোও নয়, ঢাকাও নয়। প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপরেই কয়েকটা বড় গাছ, বোধ হয় শিরীষফুলের গাছ হবে। স্টেশন প্রায় জনশূন্য, গাছগুলোতে রাজ্যের পাখির কিচির-মিচির ধ্বনিতে জায়গাটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে, দিবালোকও প্রায় নিবে এসেছে। এইখানেই আমরা নেমে পড়লুম।

প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে বেরিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের সঙ্গে লাগা যাত্রীদের ঘরে এসে এক জায়গায় বসলুম। পরিতোষ তখন শীতে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে র‍্যাপারটি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পরিতোষ বললে, যা, রোটি-গোস্ত কিনে নিয়ে আয়।

তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে একেবারে দেহ পুড়ে যাচ্ছে। বললুম, রোটি-গোস্ত আজ আর খেয়ে কাজ নেই ভাই, এত জ্বরে ওসব খাওয়া ঠিক হবে না।

পরিতোষ প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, কি খাব, খিদেয় যে মরে গেলুম রে!

বললুম, তুই শুয়ে পড়্, আমি দেখছি, কোথা থেকে যদি একটু দুধ যোগাড় করতে পারি।

কোঁচা দিয়ে পাথরের মেঝের ধুলো ঝেড়ে দিতেই সে একেবারে লাঠির মত প'ড়ে গেল।

পরিতোষের দেখাদেখি কিনা জানি না, আমারও জ্ব'র একটু একটু বাড়তে লাগল ও সেই সঙ্গে শীতে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করলুম। কোন রকমে মনের জোরে বন্ধুর পাশে কুঁকড়ে-সুঁকড়ে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে গাড়ু হয়ে ব'সে রইলুম বটে, কিন্তু জ্বরের কাঁপুনিকে ঠেকাতে পারবার মতন মনের জোর কোথায় পাব? বোধ হয় মিনিট পনেরো অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়ে একটু সামলে উঠতেই ঘরের মাঝখানে একটা বড় আলো জ্ব'লে উঠল।

ঘরের এক কোণে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা চায়ের দোকান। দোকানের সর্বাঙ্গে অ্যান্ড্রু ইউল কোম্পানির পৃথিবী-মার্কা চায়ের বিজ্ঞাপন ঝুলছে। বড় বড় কাঁচের চ্যাপ্টা বোতলের মধ্যে লেড়ো বিস্কুট ও অন্যান্য বিস্কুট ও কেক সাজানো রয়েছে, সেখানে কয়েকজন লোক ব'সে চা খাচ্ছে ও গুলতানি করছে। দোকানটার দিকে দেখতে দেখতে মনে হ'ল, হয়তো এইখানে চেষ্টা করলে একটু দুধ পাওয়া যেতে পারে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়ে চাওয়ালাকে বললুম, বাপু হে, আমাকে একটু দুধ দিতে পার? আমার বন্ধুটির জ্বর হয়েছে, একটু দুধ পেলে বড় ভাল হ'ত।

লোকটি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, আপনি কি বাংগালী?

হ্যাঁ।

আপনার বন্ধু কোথায়?

আঙুল দিয়ে পরিতোষকে দেখিয়ে দিলুম। একবার তার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা কোথায় যাবেন?

বললুম, এইখানে, তোমাদের দেশে নেমে পড়েছি, এখন ভগবান কোথায় নিয়ে যান দেখি!

একটা আধবুড়ো লোক সেখানে ব'সে চা খাচ্ছিল, আমার কথা শুনে চাওয়ালাকে আমাদেরই উদ্দেশ্যে বললে, দিওয়ানা হ্যায়।

চাওয়ালা বললে, তোমরা আজ রাতে এইখানেই থাকবে তো?

বললুম, হ্যাঁ।

তা হ'লে ঘণ্টাখানেক সবুর কর, টাট্‌কা দুধ আসবে তাই থেকে দেব। আমার কাছে দুধ আছে, কিন্তু সে সেই সকালবেলাকার দুধ, অসুস্থ লোককে তা খাওয়ানো ঠিক হবে না। ততক্ষণ ওকে এক কাপ চা খাইয়ে দাও।

প্রস্তাবটা শুনে ভালই লাগল। বললুম, আচ্ছা, আমাকে এক কাপ চা দাও তো।

আগুন-গরম এক কাপ চা খেয়ে আমার শীত তো চ'লেই গেল, পরন্তু বেশ ভালই লাগতে লাগল। আর এক কাপ চা নিয়ে গিয়ে পরিতোষকে তুলে খাইয়ে দিলুম। চা খেয়ে সে বললে, অনেক ভাল লাগছে।

চাওয়ালার প্রাপ্য দুটো পয়সা চুকিয়ে দিতে সে জিজ্ঞাসা করলে, কতখানি দুধ চাই তোমাদের?

জিজ্ঞাসা করলুম, কত ক'রে সের?

দু-আনা সের।

তা হ'লে এক সের দুধ গরম ক'রে দিও।

চা খেয়ে পরিতোষ অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। একটু পরেই কিন্তু আবার রোটি-গোস্ত খাবার জন্যে বায়না শুরু করলে, কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি না হওয়ায় সে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা, এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনে নিয়ে আয়।

আবার এক কাপ ক'রে চা খেয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ভবিষ্যতের চিন্তায় মনোনিবেশ করা গেল। ঠিক করা হ'ল, এবার যদি কোথাও আশ্রয় মেলে তো নেহাৎ অন্নদাস হয়ে আর থাকব না। বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়ে পড়াব কিংবা চাকরের কাজ করব তাও স্বীকার, কিন্তু একান্ত আশ্রয়দাতার ওপরে নির্ভর ক'রে আর কোথাও থাকব না। যদি কোথাও চাকরি না জোটে তো এবারকার মতন বাড়ি ফিরে যাব। অন্তত ছ-মাস খেয়ে-প'রে কাটাবার মতন টাকার ব্যবস্থা করতে না পারলে আর ভাগব না। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক করা গেল যে, কালই যেমন ক'রেই হোক দিদিমণিকে একখানা চিঠি লিখে সমস্ত কথা জানিয়ে দিতে হবে। কারণ সে মনে করতে পারে, তার একশো টাকা নিয়ে আমরা চম্পট দিয়েছি। আমাদের গোটা পঁচিশেক টাকা দিদিমণির কাছে জমা রেখেছিলুম, একটা ঠিকানার ব্যবস্থা হ'লে পাঠিয়ে দিতে লেখা যাবে। ছেঁড়া ধুতি জামা যা সেখানে প'ড়ে রইল তা র'য়েই গেল। ওই সঙ্গে বিশুদাকেও একখানা চিঠি লিখব, তাদের দয়ার কথা জীবনে কখনও ভুলব না।

চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ। প্ল্যাট্‌ফর্ম অন্ধকার, শুধু চায়ের দোকানে মাঝে মাঝে দু-একজন লোক এসে বসছে, খেয়ে-দেয়ে চ'লে যাচ্ছে। এইরকম প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর হঠাৎ আবহাওয়া চঞ্চল হয়ে উঠল। রেলের কুলিরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে, অন্ধকার প্ল্যাট্‌ফর্মের বাতিগুলো জ্ব'লে উঠল। টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলির সামনে ছোট একটি ভিড় জ'মে গেল, টিকিট-ঘর খুলে গেল। দেখতে দেখতে চায়ের দোকানে খদ্দেরের ভিড় লেগে গেল। বাইরে এক্কা ও টাঙ্গাওয়ালাদের চীৎকারে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠল।

আমাদের শরীর তখন বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। নিজেদের জায়গা

ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, সামনেই একটা চওড়া রাস্তা সোজা চ'লে গিয়ে অন্ধকারে মিশে গিয়েছে। দূর অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ভাবতে লাগলুম, কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তা ধ'রে এগিয়ে চলব, কোথায় কোন্ গৃহে কত দিনের মত আমাদের অন্নসংস্থান হয়ে আছে কে জানে!

কিছুক্ষণ চারিদিক ঘুরে ফিরে ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব দেখে শুনে আবার ঘরের মধ্যে নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসলুম।

দেখতে দেখতে বিকট আওয়াজ করতে করতে একটা ট্রেন এসে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকল। যাত্রী, কুলি ও ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে জায়গাটা যেন একেবারে বিষিয়ে উঠল। মিনিট দশেক বাদে ট্রেনটা চ'লে যেতেই আবার সব চুপচাপ। দেখলুম, প্ল্যাট্‌ফর্মের বাতিগুলো কিন্তু জ্বালাই রইল। চা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা যাবার এক্সপ্রেস গাড়ি আসবে।

আবার ধীরে ধীরে জনতা ও গোলমাল বাড়তে আরম্ভ করলে। পাছে আমাদের জায়গাটুকু মারা যায়, সেই ভয়ে গ্যাঁট হয়ে নিজেদের জায়গায় ব'সে রইলুম। বাইরে টাঙ্গাচক্র ও টাঙ্গাওয়ালাদের মুখরতা ক্রমেই গগনভেদী হয়ে উঠতে লাগল, এমন সময় একটি বাঙালী ভদ্রলোক, সম্মুখে মুটের মাথায় একটা বড় ট্রাঙ্ক ও তার ওপরে বিছানা, নিজের হাতে একটা বড় বালতি ও পশ্চাতে আপাদমস্তক টকটকে-লাল-র‍্যাপার-মণ্ডিত একটি মাহলা নিয়ে এসে আমাদের কাছেই জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে চীৎকার ক'রে কুলিদের বললেন, গাড়িতে তুলে দেবার পর বকশিশ মিলবে।

তারপরে ট্রাঙ্কটার ওপর থেকে বিছানার মোট নামিয়ে রেখে সেইরকম উচ্চৈঃস্বরে মহিলাটিকে বললেন, তুমি একটু ব'স, আমি মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এখুনি আসছি। টিকিট-ঘর খুলতে এখনও দেরি আছে। আজ গাড়িতে বেশি ভিড় হবে না ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে চ'লে গেলেন, আর ভদ্রমহিলা সেই ট্রাঙ্কের ওপরে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। বাঙালীর মেয়ে, রঙ হয়তো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল, কিন্তু শীতের চোটে নির্জলা শ্যামবর্ণে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর ঢলঢলে মুখ, টিকটিকে নাকে ঝকঝক করছে একটি নাকছাবি, জুলজুল ক'রে আমাদের দিকে কৌতূহলী চোখে চাইতে লাগলেন।

আমাদের চোরের মন! খালি মনে হয়, ধরা না প'ড়ে যাই! ভদ্রমহিলাকে ওই রকম ভাবে বারে বারে আমাদের দিকে চাইতে দেখে দস্তুরমতন অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। পরিতোষ একবার আমার কানে কানে বললে, কি রে বাবা! চেনাশোনা না হয়ে পড়ে!

কিছুক্ষণ বাদে ভদ্রলোক হৈ-হৈ করতে করতে ফিরে এসে চীৎকার ক'রে মহিলাটিকে বললেন, জান রাণু, মাস্টার বললে, ট্রেন আজ অন্তত আধ ঘণ্টা লেট হবে।

বুঝতে পারা গেল, আমাদের সামনে শয়নগৃহের নামে অভিহিত হয়ে ভদ্রমহিলা কিঞ্চিৎ চঞ্চল ও বিব্রত হয়ে মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে কি বললেন। স্বামীটি কিন্তু সে ইঙ্গিত ধরতে না পেরে সেই রকম উচ্চৈঃস্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি? কে? কোথায়?

এবার ভদ্রমহিলা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হয়ে একবার চারদিকে চেয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি কি বললেন। লোকটি আমাদের দিকে একবার চেয়ে একটু হেসে স্ত্রীকে কি ব'লে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ট্রাঙ্কটার ওপরে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদারা কি কলকাতায় যাচ্ছ?

গিন্নী আর সেদিকে এগুলেনই না। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে দার্শনিকের দৃষ্টিতে চায়ের দোকানের প্ল্যাকার্ডগুলো পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

আমি বললুম, কলকাতায় যাচ্ছিলুম, কিন্তু একটা বিশেষ দরকারে এখানে নেমে পড়েছি।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

কাশী থেকে।

তা টিকিট কি এই অবধি করা হয়েছিল, না হাওড়া অবধি?

হাওড়া অবধি।

তা হাওড়া তো আর যাওয়া হচ্ছে না?

না।

এবারে ভদ্রলোক ট্রাঙ্ক ছেড়ে উঠে একেবারে আমাদের কাছে এসে উবু হয়ে ব'সে বললেন, তা দাদা, টিকিট দুটো আমাকে বেচেই দাও না। আমারও সস্তায় কিস্তি হয় আর তোমাদেরও কিছু এসে যায়।

আমি বললুম, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, এ তো ভালই হ'ল।

আমার কাছ থেকে টিকিট দুখানা নিয়ে তারিখ ইত্যাদি ভাল ক'রে দেখে তিনি বললেন, ঠিক আছে। তবু ভাই একবার মাস্টার মশায়কে দেখিয়ে আনি—কি জানি কোম্পানির কারবার তো, সাবধানের মার নেই, কি বল?

ভদ্রলোক টিকিট দুখানা নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকে গেলেন। দেখলুম, ভদ্রমহিলা তেমনই দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন, একবার আমার চোখে চোখ পড়তেই সেখান থেকে আরও একটু দূরে স'রে গেলেন।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর পরিতোষ বললে, কি রে, রাজা রাণী দুজনেই যে স'রে পড়ল!

বললুম, সরবে কোথায়! ট্রাঙ্ক রয়েছে যে এখানে! দেখতে দেখতে ঘরের মধ্যে ভিড় বাড়তে আরম্ভ করল, চায়ের দোকানের তিন দিকের বেঞ্চি খদ্দেরে ভ'রে গেল। সবই বেহারী স্ত্রী-পুরুষ। কুলিদের হাল্লায় কানে তালা লাগবার উপক্রম, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ট্রেনের কোনও চিহ্নই নেই। টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি বন্ধ।

আমরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, ভদ্রমহিলা ওখানে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছেন, কিন্তু তবুও এসে ট্রাঙ্কের ওপরে বসছেন না। একবার দেখলুম, একটা কুলি মোটঘাট নিয়ে প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপর পড়তে পড়তে সামলে গেল।

ব্যাপার দেখে আমি উঠে সোজা গিয়ে তাঁকে বললুম, এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মা? এ লোকগুলোর তো হস্‌সি-দীঘ্‌ঘি জ্ঞান নেই, কখন মোটঘাট নিয়ে হয়তো ঘাড়ের ওপরেই প'ড়ে যাবে।

হঠাৎ এই ভাবে সম্ভাষিত হয়ে তিনি চমকে উঠলেন। কিন্তু হাজার হোক বাঙালীর মেয়ে, তার ওপরে মা-ডাক কানে গেছে, মুহূর্তের মধ্যেই সেই সচকিত ভাব সামলে নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল চোখে আমার দিকে ফিরে বললেন, দেখ তো বাবা! একটু হ'লেই ওই গন্ধমাদন ঘাড়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি!

বললুম, চলুন, ওখানে গিয়ে বসবেন।

আর কোন কথা না ব'লে তিনি ফিরে এসে নিজের ট্রাঙ্কটির ওপরে জমিয়ে ব'সে বালতিটা ঘ্যাড়র্‌র্‌ ক'রে কাছে টেনে নিয়ে তার মধ্যে কি খুঁজতে লাগলেন, বোধ হয় দেখে নিলেন, বালতির জিনিসপত্রগুলোর মধ্যে কোনওটি

স্থানচ্যুত হয়েছে কি না। তারপরে মুখ তুলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি বাবা?

নাম বললুম। পরিতোষটা অন্য দিকে মুখ ক'রে বসেছিল। তার উদ্দেশে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ গা ছেলে—ও ছেলে—

পরিতোষকে একটা কনুই দিয়ে খোঁচা মারতেই সে এদিকে মুখ ফেরালে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি বাবা?

পরিতোষ নাম বললে।

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

ঠিক বুঝেছি। কলকাতার লোক না হ'লে আর এমন হয়! আমিও বাবা কলকাতার মেয়ে। হোগোলকুঁড়েয় আমাদের বাড়ি। আমরা তিন বোন, তা তিনজনেরই বিয়ে হয়েছে পশ্চিমে। বাবা মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারেন না, তাই তিন বোনে পালা ক'রে বছরে চার মাস ক'রে এক-একজন বাবার কাছে থাকি। আমি গেলে দিদি চ'লে যাবে তার শ্বশুরবাড়ি মজঃফরপুরে। বাবার আমার বড় কষ্ট!

তারপরে অত্যন্ত যেন একটা গোপনীয় কথা বলছেন, এমন ভঙ্গীতে ঘাড়টা লম্বা ক'রে মুখখানা প্রায় আমাদের কানের কাছে নিয়ে এসে চুপিচুপি বললেন, মা নেই কিনা!

বাপের কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলার গলা প্রায় ধ'রে এল, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, পোড়ারমুখো ট্রেন আসতে আজ বড্ড দেরি হবে মনে হচ্ছে।

পরিতোষ বললে, ট্রেনের সময় এখনও পেরিয়ে যায় নি।

ভদ্রমহিলা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই ট্রেনেই যাবে তো?

বললুম, না, আজ আমরা কলকাতায় যাব না, এইখানে একটু কাজ আছে।

এখানে! এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আবার কি কাজ বাবা?

আছে একটু কাজ।

ভদ্রমহিলা ব'লেই চললেন, কলকাতা গিয়েই আমার সঙ্গে দেখা করবে, মাকে ভুলো না যেন। অমুক জায়গায় অমুক নম্বরের বাড়িতে গিয়ে বলবে, রাণুমার সঙ্গে দেখা করব। যখন খুশি যাবে, ভুলো না যেন। আমার স্বামীর নাম এই দেখ প্যাটরার গায়ে লেখা রয়েছে—মনে থাকবে তো?

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

পদচিহ্ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

বোমা মেরে, পিস্তলের গুলিতে সায়েবদের মেরে, তাদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে চায় যারা, তারা নবগ্রামের মানুষদের কাছে অভূতপূর্ব বিস্ময়ের মানুষ। কিছুদিন থেকে তারা বোমার দলের কথা শুনছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা শুনেছে, কানাই, সত্যেনের ফাঁসির কথা শুনেছে, অরবিন্দ, বারীন, উল্লাসকর, উপেন, হেম কানুনগোর বিচারের কথা শুনেছে; সাপ্তাহিক হিতবাদী, বঙ্গবাসী থেকে গ্রামের ভদ্রজনেরা এসবের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে পড়েছেন। উত্তেজনা বোধ করেছেন, এদের মনে মনে তুলনা করেছেন শাপভ্রষ্ট দেবতার সঙ্গে; কেউ কেউ বলেন, দ্বাপরের বীরেরা ভারতবর্ষকে অধর্ম থেকে, অ-হিন্দুর হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য জন্মান্তর গ্রহণ করেছেন। আজ তাদের সেই বিস্ময়ের রঙিন রোমাঞ্চকর কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেল অকস্মাৎ।

রাধাকান্তের শ্যালক রবি ব'লে সেই ছেলেটি, আর এই গ্রামেরই অবহেলিত কিশোর, তারা নাকি সেই দলের লোক! এ কথা তাদের বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশ্বাস করতে গেলে মনে হয়, বোমা পিস্তল নিয়ে যারা সায়েব মেরে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চায়, তাদের উপর আস্থা থাকে না; ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও শূন্যে মিলিয়ে যায় আকাশ-কুসুমের মত। ভদ্রজনেরা একবাক্যে বললেন, পুলিস ভুল করেছে।

আলোড়ন এবং বিস্ময় সবচেয়ে বেশি হ'ল কিশোরের সমবয়সীদের মধ্যে। গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে পবিত্র এবং তার বন্ধুবান্ধবেরা প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিশোর তাদের নিয়ে যে সংঘটি গ'ড়ে তুলেছিল, তার কাজকর্ম এখন বন্ধ; দরিদ্র ভাণ্ডারের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে আর মুঠির চাল তোলা হয় না, তীরধনুক, লাঠিখেলা ও কুস্তির যে আখড়া হয়েছিল, সে আখড়ায় আর কেউ যায় না। তবে যুবশক্তির চুপ ক'রে ব'সে থাকা ধর্ম নয়, সেই স্বধর্মের প্রেরণায় তারা গানবাজনার চর্চাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরেছে। পবিত্রের প্রিয়তম পারিষদের অন্যতম মঙ্গলের বাপের এক সদ্য-কেনা প'ড়ো বাড়িতে তাদের আড্ডা বসছে। ঘরখানিকে চুনকাম করিয়ে, দরজায় জানালায় আলকাতরার বদলে সবুজ রঙ দিয়ে, খানকয়েক রবিবর্মার ছবি ও খানকয়েক বিলাতী মেমের ছবি টাঙিয়ে যথাসাধ্য আধুনিক ক'রে তুলে, তার নাম দিয়েছে

'কনট্রোলাবুস্ অফিস'। নামটার অন্তর্নিহিত অর্থ হ'ল, এইখানে সমবেত যুবসংঘ অতঃপর নবগ্রামের সকল কর্ম 'কনট্রোল' অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করবে। অন্যায়ের প্রতিকার করবে, প্রতিবাদ করবে, নূতন কল্যাণকে স্থাপন করবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। শিল্প-কলার চর্চা করবে, সাহিত্য ও সঙ্গীতের যাতে প্রসার ও প্রচার হয়, তার ব্যবস্থা করবে। দলের অধিকাংশ সভ্যই সদ্য সদ্য পড়া ছেড়ে ঘরে বসেছে। এনট্রান্স স্কুলের থার্ড ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে—জেলার এনট্রান্স স্কুলে, ছ-আনা দশ-আনা চুল ছাঁটার অধিকার ও অভ্যাস নিয়ে এসেছে সেখান থেকে, চুল ছাটিতে পর্যন্ত শিখে এসেছে, ডাব্‌ল্‌ব্রেস্ট শার্ট, ওপেনব্রেস্ট কোটের রেওয়াজ এনেছে। পবিত্র স্বাভাবিকভাবেই এদের দলপতি। স্বাভাবিকভাবে অর্থে, পৈত্রিক অর্থপ্রাচুর্যও বটে এবং তার কতকগুলি স্বকীয় গুণও বটে। পবিত্র এনট্রান্স ফেল ক'রে আর পড়ে নাই। কিন্তু কাব্য-চর্চা করে সে। কাব্যের প্রতি তার অনুরাগ আছে। কবিতা লেখে। সঙ্গীতের প্রতিও তার অনুরাগ অকৃত্রিম। কণ্ঠস্বর ভাল নয়, কিন্তু তাই নিয়েই তার সাধনার বিরাম নাই, এবং মেজে-ঘষে কাল মেয়েকেও যেমন শ্যামবর্ণা ক'রে তোলা যায়, তেমনি ধারায় স্বর যেমনই হোক, তার মধ্যে সুর সে এনেছে। তবলা শিখবার অনুরাগও খুব। মঙ্গল এবং পবিত্র দুজনে মিলে একজন ওস্তাদ রেখেছে। ওস্তাদ তিনকড়ি গোঁসাই, এই কনট্রোল আপিসেই থাকে, মঙ্গলের বাড়িতে খায়, মাইনে দেয় পবিত্র। বাঁয়া-তবলা কিনেছে মঙ্গল, হারমোনিয়ম কিনেছে পবিত্র। সকাল থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যে কনট্রোল আপিসের সামনের রাস্তা দিয়ে যায়-আসে, সেই শোনে, কেউ না কেউ মুখে বোল আউড়ে বাঁয়া-তবলায় সেই বোল তোলবার চেষ্টা করছে—ধা-তিন-ধা, অথবা তা-তেরে-খেটে তা-তেরে-খেটে, কিম্বা গদ্দি-ধেনে-না-ক ইত্যাদি।

পবিত্রকে দেখা যায় বই হাতে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পর্যন্ত সে পড়ে। নাটকে তার অনুরাগ সবচেয়ে বেশি। গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এই তিনজন নাট্যকারের প্রতিটি নাটক সে পড়েছে এবং কলিকাতায় প্রতিটি নূতন নাটকের অভিনয় সে দেখেছে। তার মনে মনে অভিপ্রায় রয়েছে, এই সংঘের উদ্যোগে একটি নূতন লাইব্রেরি এখানে সে স্থাপন করে এবং একটি শখের থিয়েটারের দল। এ যুগে থিয়েটার কথাটাই প্রচলিত ছিল, থিয়েটারকে এ দেশের নিজস্ব করবার প্রয়াসে, মেমসায়েবকে

কাপড় পরানোর মত নাট্যসংঘ নাম করার রেওয়াজ ওঠে নি। যাক সে কথা। পবিত্রের অভিনয়ে শখও ছিল এবং অভিনয়ের শক্তিও ছিল। শুধু এইটুকুর জন্যই সে এখানে থিয়েটারের দল গড়তে চায় না, থিয়েটারের মধ্য দিয়ে এখানে সে দেশপ্রেমেরও প্রচার করতে চায়।

বোমা-পিস্তলের দলের সভ্য সন্দেহে সদর শহর থেকে ডিটেক্‌টিভ ডিপার্ট্‌মেণ্টের কর্মচারী এসে কিশোর এবং রাধাকান্তের শ্যালক রবিকে থানায় নিয়ে গিয়েছে, সংবাদটা শুনে পবিত্রই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়াভিভূত হ'ল। এও কি সম্ভব? সে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

মঙ্গল বললে, দূর দূর! বাজে, বাজে! কিশোর, আমাদের কিশোর, পুলিসের ভয়ে যে মিটিং ভেঙে ড্যাঙায় গিয়ে ব'সে থাকে—

পবিত্রের অন্যতম প্রিয় পারিষদ হ'ল 'পিরু', পিরুর ভাল নাম একটা আছে, সে নামটা যুক্তাক্ষরবহুল জটিল এবং দুর্বোধ্যও বটে এবং পিরু নামের অতি-প্রচলন-হেতু প্রায় অপ্রচলিতও বটে, সে নামটা হ'ল 'শুভ্রেন্দু'। শুভ্রেন্দু ফিফ্‌থ্ ক্লাস অর্থাৎ মাইনর স্কুলের ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। সে নবগ্রামের প্রাচীনতম অভিজাত ব্রাহ্মণ-বংশ সরকার-বাড়ির এক নিঃস্বপ্রায় অংশীদারের সন্তান। সরকার-বংশের দোষ-গুণ বাদ দিয়ে তার একটি স্বকীয় গুণ আছে, সে রসিক লোক। সে এবং মঙ্গল সদ্য পবিত্রের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে পণ্ডিত ক্ষীরোদ-প্রসাদের প্রতাপাদিত্য অভিনয় দেখে এসেছে। মঙ্গলের কথাটা কেড়ে নিয়ে পিরু প্রতাপাদিত্যের ভবানন্দের একটি উক্তি আবৃত্তি ক'রে উঠল, 'সুয্যিগুহ, সুয্যে, যাকে আমরা গুয়ে গোবরা বলতুম! ছেলেবেলায় চেল-ডিগ-ডিগ খেলতে গিয়ে পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ত, সেই—সেই হ'ল সেনাপতি?—ব'লে সে হা-হা ক'রে এক নাগাড় হাসতে লাগল।

মঙ্গলও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করলে তার পরের অংশ—বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায়ের বক্তৃতা। সে বললে, হেসে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না ভবানন্দ। সেনাপতি সূর্যকান্ত প্রায় দিগ্বিজয় ক'রে ফিরে এল। বারভূঁইয়া এসে প্রতাপাদিত্যের পায়ে পাগড়ি রাখলে। ঈশা খাঁ মনসর আলি এসে পর্যন্ত তাকে বড় ব'লে স্বীকার ক'রে গেল। ধূমঘাটে রাজধানী হবে। পূর্ণিমায় লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা সেখানে। যাও, গিয়ে ধূমঘাট আগে দেখে এস, তারপর কথা ব'লো।

পিরু এবার বুকে হাত বুলিয়ে, মুখে কুটিল হিংসার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে অবিকল কলকাতার ভবানন্দের মত বললে, বুক জ্ব'লে গেল ছোট কুমার, বুক জ্ব'লে গেল। খানিকটা পায়চারি ক'রে সে আবার বললে, আমিও ভবানন্দ শর্মা, আমিও মামীমার খেল দেখিয়ে দেব।

অকস্মাৎ পবিত্র উঠে বিনা বাক্যব্যয়ে কন্‌ট্রোল আপিস থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

ওদিকে জনসাধারণের অগোচরে আর এক স্থানে ঠিক এর বিপরীত-ধর্মী একটি চাঞ্চল্য অথবা আলোড়ন জেগে উঠেছিল।

নবপ্রতিষ্ঠিত বোর্ডিঙে।

আজই বোর্ডিং-হাউস ওপেন করেছেন কমিশনার সাহেব। সেখানে কুড়িটি ছেলে ভর্তি হয়েছে। ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পরই এখানে গ্রামের মধ্যে একটা খ'ড়ো ঘর ভাড়া ক'রে অস্থায়ী বোর্ডিং-হাউস স্থাপিত হয়েছিল, সেখানকার ছেলেরা আজই উঠে এসেছে নতুন বোর্ডিং-হাউসে। সেই বোর্ডিং-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ওই কুড়িটি ছেলে এবং স্কুলের স্থানীয় ছাত্রেরা সমবেত হয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল। আলোচনা করছিল পরস্পরের মধ্যে। একটা ভয়ে তাদের বুক গুরগুর করছে, তবু এক প্রচণ্ড আকর্ষণময় বিস্ময় অনুভব না ক'রে পারছে না।

এরই মধ্যে তারা ছোট ছোট দলে থানার সামনে রাস্তার উপরে ঘুরে এসেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করে নি, কিন্তু সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে থানার ভিতরের দিকে চেয়ে চ'লে গিয়েছে, ফিরে এসেছে, আবার গিয়েছে, আবার এসেছে।

তাদের এই ঘোরাফেরা জনসাধারণের অগোচর থাকলেও পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নাই। শেষের দলটি যখন থানার সামনে ঘুরছিল, তখন সদর শহর থেকে যে দুজন পুলিস-কর্মচারী এসেছিলেন, তাঁদের একজন থানার বারান্দায় বেরিয়ে এসে ছেলেদের ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কি করছ তোমরা এখানে?

ছেলেদের দলটি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। কোন উত্তর দিতে পারে নি।

নবগ্রামেরই একটি ছেলে, এই গ্রামের সরকার-বংশীয়দের বাড়ির ভাগ্নে, নাম দুর্গাপদ, সে অবশেষে আইন দেখিয়ে উত্তর দিয়েছিল, কি করব আমরা? কিছুই করি নি। গভর্মেণ্টের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা।

হুঁ ! গবর্ণমেণ্টের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে তোমরা ?

হ্যাঁ।

কি নাম তোমার ? বাড়ি কোথায় ? বাপের নাম কি ? কোন্ ক্লাসে পড় ?

জমিদারের ভাগ্নে নবগ্রামবাসী দুর্গাপদর গলা শুকিয়ে গেল এবার। সে সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল পুলিস-কর্মচারীটির মুখের দিকে। পুলিস কর্মচারীটি তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, এস, তোমরা থানার ভেতরে এস। তোমাদের উপর আমাদের সন্দেহ হচ্ছে।

ছেলেগুলি পাথর হয়ে গেল যেন। হঠাৎ দলের পিছন দিকে একটি ছেলে ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

পুলিস-কর্মচারীটি তার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এই ছোকরা, কাঁদছ কেন তুমি ? কি নাম তোমার ?

ছেলেটি চোখ মুছতে মুছতে উত্তর দিলে, আমার নাম স্যার বৃন্দাবন পাল, আমার বাড়ি স্যার গোয়ালপাড়া। এখানে ইস্কুলে পড়ি। মীটিং দেখে বাড়ি যাচ্ছি স্যার। এরা সবাই এখানে দাঁড়িয়েছিল স্যার, তাই একবার দাঁড়ালাম।

পুলিস-কর্মচারীটি হেসে বললেন, আচ্ছা, যাও তুমি, বাড়ি চ'লে যাও।

বৃন্দাবন আর মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে থানার দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে হনহন ক'রে চলতে আরম্ভ করলে। রাস্তায় নেমে তার ছুটতে ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু ভয়ে সে ছুটতে পারলে না। দ্রুতপদেই হাঁটতে শুরু করলে। নবগ্রাম পার হয়ে এসে একটা গাছতলায় দাঁড়াল। চোখ দিয়ে তার জল পড়ছিল। অদূরেই মহাপীঠ দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা ক'রে সে এসে উঠল মহাপীঠে। দেবীমন্দিরের সম্মুখে 'পাট-অঙ্গনে' লুটিয়ে প'ড়ে প্রণাম করলে। মনে মনে বললে, মা, তুমি রবিবাবু আর কিশোরবাবুকে রক্ষা কর। ইংরেজ রাজত্বের সে অবসান কামনা করলে, পুলিসকে সে অভিশাপ দিলে।

মহাপীঠ থেকে বের হতেই কে তাকে পিছন থেকে, অর্থাৎ নবগ্রামের দিক থেকে ডাকলে, বৃন্দাবন !

বৃন্দাবন চমকে উঠল আতঙ্কে। আবার তাকে নবগ্রামের দিক থেকে কে ডাকলে ? আবার কি পুলিস থেকে লোক এসেছে তাকে ডাকতে ? সভয়ে নবগ্রামের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

পুলিস নয় ; তার দাদা তাকে ডাকছে। নবীন তার দাদা। গোপপল্লীর

রঙ্গলাল মণ্ডলের ছেলে নবীন। নবীন এখন কাজ করে গোপীচন্দ্রের এস্টেটে। পুলিসে ছেলেদের ডেকেছিল এবং সেই দলের মধ্যে বৃন্দাবন ছিল এই সংবাদ পেয়ে নবীন ছুটতে ছুটতে আসছে। নবীন বৃন্দাবনকে তিরস্কার করলে। বললে, বাবুভাইদের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গ করলে তোমার চলবে না। তুমি লেখাপড়া কর। লেখাপড়া শিখে সরকারী চাকরি পেলে তবে লোকে আমলে আনবে। ওদের সঙ্গে তুমি মিশো না। ওদের ঘরে ভাত আছে। ওরা যা করে তাই শোভা পায়। আর এসব হচ্ছে বাঁদরামি।

বৃন্দাবন চুপ ক'রে রইল। ভয় সে যথেষ্টই পেয়েছে, ওদের সঙ্গে সে আর মিশবেও না—এও সত্যি কথা। কিন্তু দাদার কথার সুরকে সে মানতে পারলে না। ওই কিশোরবাবু এবং রবিবাবু বাঁদরামি করেছে—এ কথা তার ভাল লাগল না।

নবীন আবার বললে, হেডমাস্টার মশায়, অমরবাবু সব শুনেছেন। তাঁরা কি বলছেন দেখগে। কাল ইস্কুলে মীটিং হবে। যাও, এখন বাড়ি যাও।

বৃন্দাবন কোন উত্তর না ক'রেই ভারাক্রান্ত মনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'ল। নবীন ফিরল নবগ্রামের দিকে।

বৃন্দাবন বাড়ি ফিরে দেখলে, তাদের বাড়ির সামনে তার বাপকে কেন্দ্র ক'রে গোপপল্লীর মণ্ডলেরা ব'সে গিয়েছে। হুঁকো চলছে হাতে হাতে। জোর আলোচনা চলছে কিশোর এবং রবিকে নিয়ে। সংবাদটা এরই মধ্যে এখানে এসে পৌছে গিয়েছে।

* * *

কমিশনার সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব এঁরাও ঘটনাটা শুনে গিয়েছেন। সদরের-পুলিস কর্মচারী এখানে এসেই পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন। পুলিস-সাহেব ঘটনাটা ব্যক্ত করেছেন কমিশনার এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কমিশনার খাস বিলাতী সাহেব, সিঁদুরে মেঘের মত আরক্ত ক্রুদ্ধ মুখে ঘটনাটা গোপীবাবু এবং অমরবাবুকে ব'লে বললেন, দেখ গোপীবাবু, তুমি এখানকার প্রধান ব্যক্তি। তোমার উপর আমরা অনেক ভরসা করি। তোমার মত লোক এখানে থাকতে এ গ্রামের ছেলেরা এই সব শয়তানী বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে ভ্রান্তপথে যায়, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন গোপীচন্দ্র কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আমাকে যে কথা

বললেন হুজুর, সে আমার মনে থাকবে। আমার কর্তব্য পালন আমি অবশ্যই করব।

ধন্যবাদ দিলেন সাহেব। বললেন, তোমার মত ব্যক্তিকে গবর্মেণ্ট অবশ্যই সম্মান করবেন। এ কথা তুমি মনে রেখো।

সাহেবরা এর পর উঠলেন। গোপীচন্দ্র বললেন, হুজুর, তা হ'লে মনে ক'রে যেন দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বাড়ির প্ল্যান পাঠিয়ে দেবেন। আমি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়ি শেষ করাব। হুজুর এসে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন—এই আমার বাসনা।

সাহেব এতক্ষণে একটু হাসলেন।

সাহেবদের বিদায় দিয়ে গোপীচন্দ্র এসে বসলেন। সামনে ব'সে ছিলেন অমরচন্দ্র এবং কীর্তিচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের মুখ গম্ভীর। গৌরবর্ণের মধ্যে রক্তাভা উগ্রভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হ'ল, তাঁর এই আয়োজনকে ব্যর্থ করবার জন্যই যেন এটা একটা ষড়যন্ত্র। রাধাকান্ত, কিশোর, রবি—এরাই দায়ী; এমন কি রবির ভগ্নী রাধাকান্তের স্ত্রীও যেন এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছেন। রাজপুরুষদের আহ্বান ক'রে এনে তিনি যখন তাঁদের সম্মান করতে চাইছিলেন, তাঁদের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিলেন নবগ্রামের উপর, তখন এই ঘটনাটি ঘটায় তাঁর সকল আয়োজন ম্লান হয়ে গেল। রাজপুরুষেরা অসম্মানিত হয়ে ফিরে গেলেন।

এর প্রতিকার করতেই হবে।

তাঁর মনের মধ্যে বাজছিল কমিশনার সাহেবের কথা। এখানকার সকল কাজ—ভাল মন্দ সমস্ত কিছুর দায়িত্ব তাঁর, রাজপুরুষ স্বীকার ক'রে গেলেন। ভাগ্য ইঙ্গিতে বার বার সত্যকে প্রকাশ করছে। এ গ্রামের দায়িত্ব তাঁর—একমাত্র তাঁর। তিনি যে পথে নিয়ে যাবেন, সেই পথে এখানকার মানুষকে চলতে হবে।

অমরচন্দ্রের মত কৃতী শিক্ষিত মানুষ গোপীচন্দ্রের সে মুখ দেখে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা ক'রে ছিলেন। আদরের সন্তান কীর্তিচন্দ্র, তিনিও কথা বলতে সাহস করেন নি।

হঠাৎ গোপীচন্দ্র উঠলেন। বললেন, অমর, তুমি কীর্তিকে নিয়ে থানায় যাও। ছেলে দুটিকে বল, তারা যা জানে সব যেন অকপটে স্বীকার করে। বলবে, আমি বলেছি। তাদের যাতে সাজা না হয়, খালাস পায়, সে চেষ্টা আমি করব। মামলা লড়ব। আমি যাচ্ছি রাধাকান্তের কাছে। তার—

মুখখানা তাঁর রক্তোচ্ছ্বাসে ভ'রে উঠল। আজ তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন, রাধাকান্তের প্রতি তাঁর একটা কঠিন বিতৃষ্ণা আছে। বহুদিন ধ'রে মনের মধ্যে অজানা একটা সঞ্চিত ক্ষোভ অকস্মাৎ আজ আত্মপ্রকাশ ক'রে জানিয়ে দিলে তার অস্তিত্ব। গোপীচন্দ্রের মনে হ'ল, স্বর্ণবাবুর শত্রুতা তুচ্ছ; কতটুকু শক্তি তার? যে অস্ত্রে স্বর্ণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছে, স্বর্ণের সে অস্ত্র অতি দুর্বল, তাতে তার পারঙ্গমতাও নাই। বিষয় এবং অর্থ নিয়ে যুদ্ধকে তাঁর কোন ভয় নাই। কিন্তু রাধাকান্ত তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, একটা রহস্যময় শক্তি নিয়ে। সে শক্তিতে রাধাকান্ত দুর্বল নন। এ শক্তির কি নাম তিনি দেবেন ভেবে পেলেন না। পুণ্যের শক্তি, মনের শক্তি? কোনটাই মনোমত হ'ল না। ঠিক তাঁর মতই রাধাকান্ত শক্তি বংশানুক্রমে সঞ্চয় ক'রে যাচ্ছেন। মনে পড়ল রাধাকান্তের স্ত্রীর কথা, তাঁর ছেলেটির কথা। তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন। মনে হ'ল, রহস্যাবৃত ভবিষ্যতের বিপদ-চিহ্নের মত একটা চিহ্নকে যেন তিনি চিনতে পেরেছেন।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গান্ধী-বাণী-কণিকা

(ইংরেজী হইতে ছন্দে অনুবাদিত)

১

মহাত্মা আমি নহি;
দীন হতে দীন, মহৎ নামের
দুর্ভোগ শিরে বহি।
নহি মুনি ঋষি, নহি অবতার,
নহি আমি সন্ন্যাসী,
গৃহবাসে আমি দশের সেবক—
শুধু সত্যান্বেষী।
এ কথাও জেনো ঠিক—

সাধুবেশে আমি নহি রাজনৈতিক।
সকল জ্ঞানের উৎস—সত্য,
তাই বুঝি মাঝে মাঝে
রাজনৈতিক বিচক্ষণতা
দেখা দেয় মোর কাজে।
সত্য এবং অহিংসা ছাড়া
আন্ পথ জানা নাই,
এর বিনিময়ে জন্মভূমির
মুক্তিও নাহি চাই।
জানিয়াছি আমি সার—
সত্যকারের মুক্তি লভিতে
আন্ পথও নাহি আর।

২

মানুষের সেবা করি'
আমি পেতে চাই মোর হরি;
আমি জানি জানি—তাঁর বৈকুণ্ঠ যে
মানুষের অন্তরই।

৩

যে দুঃখ আর যে নৈরাশ্য
পড়ে মোর চোখে নিত্য,
—ভাগ্যে আপনি ভগবান মোর
ভরিয়া আছেন চিত্ত,—
নহে হারাইয়ে জ্ঞান
উন্মাদ হয়ে জাহ্নবীজলে
কবে ত্যজিতাম প্রাণ।

৪

সব মানবের সাথে
বাঁধা আছি আমি অংশের মত
পূর্ণের সত্তাতে।

চোখের উপর মোর দেশবাসী
মোর প্রতিবেশী যারা
কত অসহায় কত নিরুপায়
অসাড় জড়ের বাড়া!
তাহাদের সেবা ছাড়ি'
হিমালয়ে যেতে পারি?
আমি যে জেনেছি মানুষের মাঝে
সাক্ষাৎ পাব তাঁরি।

৫

পরাজয়ে নাহি ডরি,
সুকঠিন ঘায় সে তুলে আমায়—
নব-উদ্যমে ভরি।
নিজে ভগবান সারথি আমার
সত্যের রথোপরি।

৬*

হতে পারি আমি হেয়;—
সত্য যখন স্ফুরে রসনায়
তখন অপরাজেয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সংবাদ-সাহিত্য

"প্রত্যক্ষ" বস্তুটার উপর বাংলা সরকারের বরাবরই আস্থা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত সেই প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুচুরির মামলায় আদালতে জবানবান্দ করিয়াছিল, সে তো আর কম দিনের কথা নয়। তখনই সরকার বাহাদুরের প্রত্যক্ষের প্রতি আকর্ষণ প্রমাণ হইয়াছিল। সেদিনও কলিকাতায় প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের বিচারে প্রত্যক্ষেরই জয় হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ ভিয়েৎনামের নামে একদল অস্ত্রহীন মুখসর্বস্ব ছাত্র চিরাচরিত প্রথায় একত্র গুলতানি করিবে, প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী বাংলা সরকার তাহা সহিতেই

* I may be a despicable person, but when Truth speaks through me I am invincible.
M. K. Gandhi

পারেন না। প্রত্যক্ষে দল বাঁধিয়া রাহাজানি পর্যন্তও চলিতে পারে। অপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিরোধে সুতরাং রক্তপাত অনিবার্য।

* * *

অপ্রত্যক্ষে একদল ফড়ে বা দালাল কৃষকদের নিকট হইতে শস্যাদি খরিদ করিয়া এতকাল লাভবান হইতেছিল, তাহাতে জনসাধারণের লাভ এই ছিল যে, তাহারা চাল ডাল তেল নুনটা চাহিদামত পাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সরকার বাহাদুর তাহা বরদাস্ত না করিয়া ব্যাপারটা যাই প্রত্যক্ষের গোচরে আনিলেন, প্রত্যক্ষ কয়েকজনই ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিলেন, অপ্রত্যক্ষদের চালাকি আর চলিল না। ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা পুলিস রাজধানী ও জিলাগত শাসন—প্রত্যেক ব্যাপারেই বাংলা দেশে এই ভাবে প্রত্যক্ষের লীলা অবাধে চলিতেছে। স্বভাবতই অপ্রত্যক্ষের নাজেহাল হইতেছে। অপ্রত্যক্ষের বিশৃঙ্খলায় ।ঘটা তেলটা মাছ-মাংস-দুধটার সহিত সাধারণের কচিৎ কদাচিৎ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু প্রত্যক্ষের স্বর্ণশৃঙ্খলবন্ধনে যেদিন হইতে আমাদিগকে বাঁধা হইয়াছে, সেইদিন হইতে ওইসকল অনাবশ্যক বস্তুর পিছনে, মরীচিকার পিছনেও বলা চলে, বাংলা সরকার বাহাদুরের ভাগ্যবান প্রজারা আর ছুটিবার অবকাশই পায় না, তাহাদের সময় ও স্বাস্থ্য, চিত্ত ও বিত্ত নানাবিধ সৎকাজে ব্যয়িত হইতেছে। মরীচিকা বলিলাম এইজন্য যে, ওই বস্তুগুলির অভাবে কাহারও কোনও ক্ষতি হইয়াছে এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। আসলে বস্তুগুলি স্বর্ণমৃগের মত আমাদের সীতা, অর্থাৎ ইজ্জৎ, হরণেরই সহায়তা করিয়াছে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বাংলা দেশ হইতে ওই সকল অপ্রত্যক্ষ অবাস্তব বস্তুর মোহ দূর করিয়া প্রত্যক্ষ সরকার মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

* * *

প্রত্যক্ষের আরও অনেক সুবিধা ক্রমশ প্রকট হইতেছে। বর্তমান অজ্ঞান ও অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা প্রত্যক্ষ-বন্দনা জুৎমত করিতে পারিতেছি না। তবে আশা আছে, বাংলা দেশের ঘরে ঘরে একদিন গঙ্গাস্তোত্র-মাহন্নস্তোত্রের মত প্রত্যক্ষ-স্তোত্রও সাড়ম্বরে পঠিত হইবে, তখন আর আমাদের কোনও দুঃখ, কোনও অভাবই থাকিবে না। প্রত্যক্ষ একের নিকট আমাদের প্রার্থনা সহজেই পৌঁছিবে, অপ্রত্যক্ষ তেত্রিশ কোটির দরবারে আমাদিগকে অকারণ মাথা ঠুকিয়া মরিতে হইবে না। প্রত্যক্ষের মহিমা আমরা প্রত্যক্ষত বুঝিয়াছি বলিয়াই বাংলা দেশের একদল এই প্রত্যক্ষের প্রেমপাশ হইতে মুক্তি চাহিতেছেন

দেখিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছি। যাহা হইবার নয় বা যাহা হইতে পারে না, তাহা লইয়া অকারণ কালক্ষেপের পক্ষপাতী আমরা নহি। আমরা চাই, বাংলা দেশের সকলেই দস্তুরমত প্রত্যক্ষের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠুন। যাহা সত্য এবং যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাকে এড়াইয়া খরগোশের মত অপ্রত্যক্ষের বালুরাশির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না। প্রত্যক্ষের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষের একটা রফা শেষ পর্যন্ত করিতেই হইবে।

—

বঙ্গদেশকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে আমরা গতবারে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়াছিলাম, সেই সম্পর্কে এই আন্দোলনের দুইজন উদ্যোক্তার নিকট হইতে দুইটি পত্রাঘাত আসিয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার লিখিয়াছেন—

খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা দর্শকেরাই খেলার বেশির ভাগ দেখিয়া থাকেন। গত পৌষ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে পশ্চিম-বঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমরা আশা করি নাই তিনি এই আন্দোলনকে "সর্বনাশা আন্দোলন" নামে অভিহিত করিবেন। কম্যুনিষ্ট দৈনিক 'স্বাধীনতা'ও ইহাকে "ঘৃণ্য" বলিয়াছেন। "মুসলিম লীগই বা পাকিস্তান হইতেছে ভাবিয়া উল্লাস কেন করিতেছেন—এই সব কূট প্রশ্নের সমাধান যাঁহারা করিতে পারেন, আমরা তাঁহারা নহি"—এই কথা বলিয়া প্রশ্নটির সমাধান এড়াইয়া যাওয়া আপনাদের মত সুধী চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকগণের কর্তব্য কি? আমাদের আন্দোলন দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে এমন অভিযোগ এই আন্দোলনের বর্তমান নেতাগণকে দেশদ্রোহীর পর্যায়ে ফেলে। তাঁহারা দেশের জন্য প্রাণপাত করিতে গিয়া এমন পন্থা কেন অবলম্বন করিলেন? যদি অন্য কোনও ভাল পথ ও মত থাকে তাহা দেশবাসী বলিয়া দিন, আমরা বুঝিতে পারিলে তাহাই অবলম্বন করিব।

মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদের মত লোকও লীগে ঢুকিয়াছেন বলিয়াই আমাদের ভরসা কমিয়াছে। আপনাদের উদ্ধৃত তাঁহার সুদীর্ঘ বিবৃতিতে অনেক ভাল কথা আছে (এই বিবৃতি কোন্ সময়ের জানি না) কিন্তু কার্যস্থলে আমরা কি দেখিতেছি? যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ধনেপ্রাণে বলি দিবার অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে আপনারা করিয়াছেন, সেই বলি আজ কে দিতেছে? মুসলিম লীগের অল্পমাত্রসংখ্যা-গরিষ্ঠতায় বাংলার জাতীয়তাবাদী তথা হিন্দুগণের ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ধন-প্রাণ এখনও কি বিপন্ন হয় নাই? যুক্তনির্বাচন (Joint Election), সমসংখ্যা (Parity) বা উপপ্রদেশ (Sub-Province) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইলেও কি বাংলার জাতীয় কৃষ্টির স্রষ্টা ও ধারক বাঙালী হিন্দুর তেমন কোনও সুবিধা হইবে? পূর্ববঙ্গের জনৈক বন্ধু আমাদের আন্দোলন সমর্থন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ববঙ্গে ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার

জন্যই আমরা পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করিতে চাই। যদি মরিতেও হয়, তাহা হইলেও আমাদের দুঃখ নাই। ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে, দুই ভাই এক সঙ্গে পুড়িয়া মরিলে কি লাভ? তবুও যদি একজন বাহির হইয়া যাইতে পারে, বংশরক্ষা হইবে, এবং বাহির হইতে জল আনিয়া সে হয়তো আগুন নিবাইয়া আমাকেও বাঁচাইতে পারে।"

তাই এই আন্দোলন আরম্ভ হইবামাত্র, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের বহু স্থান হইতে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে আমরা সমর্থন পাইতেছি। মুসলমানলঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহ হইতেই পাকিস্তান আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থনলাভ কেন হইয়াছে? মুসলমানগরিষ্ঠ বাংলা ও পাঞ্জাবে আজিও পাকিস্তান সমস্ত মুসলমানের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে নাই। বিহারের উৎপীড়িত মুসলমান আজ দলে দলে বাংলায় স্থান পাইতেছে। পূর্ববঙ্গে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, মেঘনাদ সাহা, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দুরা বহুদিন আগে হইতেই কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলায় আসিয়াছিলেন—গত দাঙ্গাহাঙ্গামার পর উৎপীড়িত পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এই অঞ্চলেই আসিয়াছেন। নোয়াখালি ত্রিপুরার প্রতিঘাত বিহার হইতে আসিয়াছে—লীগশাসিত হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গকে ডিঙাইয়া, এমনটি কেন হইল, ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রাণ দিয়া রোধ করিয়া আবার কোন্ মুখে বাংলাকে দুভাগ করিতে বলিব? সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। অখণ্ড ভারতকে জবাই করিবার জন্য যাহারা ছুরি শানাইতেছে, তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাকামী ভারতের অন্যতম একটি প্রদেশ হইয়া আমরা লড়িতে ও বাঁচিতে চাই। জাতীয়তাবাদের শত্রুতায় যাহারা গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া ব্রিটিশকে এদেশে কায়েম রাখিতে চায় এবং নিজেকে আমাদিগ হইতে ভিন্নজাতি মনে করে, তাহাদের সহিত একত্র থাকিয়া আমরা কিরূপে বাঁচিব বা নিজেদের চরমমুক্তির পথে অগ্রসর হইব জানি না। একান্নপরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হইলে পৃথক হইয়া যাওয়াই শ্রেয়। আপোষে ইহাই একমাত্র পথ নয় কি? গৃহযুদ্ধই সর্বনাশের পথ—আমাদের আন্দোলন সেই সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার পথ নির্দেশ করিতেছে মাত্র।

* *

শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন—

গত পৌষ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে পশ্চিম-বঙ্গ সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঐ প্রসঙ্গে আপনি মন্তব্য করিয়াছেন যে "পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ধনেপ্রাণে বলি দিয়া আজ পশ্চিম-বঙ্গের আত্মরক্ষার উপায় নাই।...অন্য উপায়ে বাংলা দেশকে সমগ্রভাবে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।"

আপনার ন্যায় অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে যে 'পশ্চিম-বঙ্গ' আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলে পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুরা খুবই বিপন্ন হইবেন। একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, এই ভীতি অমূলক।

বর্তমানে হিন্দুরা বঙ্গদেশের কমবেশি শতকরা ৪৫ জন। ইহা একটি unalterable fact. কিন্তু লোকসংখ্যার এই সামান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, শাসনাধিকার হিন্দুদের কিছুমাত্র নাই। মুসলিম লীগ বর্তমানে শাসনাধিকারী। কিরূপে শাসন চলিতেছে তাহা কাহারও অজানা নাই।

নূতন শাসন-পরিকল্পনা যেমনই হউক বা যখনই হউক, তাহাতে মুসলিম লীগের প্রাধান্য অনিবার্য। মুসলিম লীগের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যনীতি হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহাদের পরিকল্পিত শাসনযন্ত্র কোনও ক্রমেই হিন্দুদের সাহায্যকরী হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্তমানের লোকসংখ্যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় একরূপ থাকিলেও বাঁচিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বর্তমানেই যেভাবে বৈষম্যমূলক শাসননীতি চলিতেছে, হিন্দুর জনসংখ্যা আরও কমিয়া যাইলে তাহা অপেক্ষা অধিক কি ক্ষতি হইবে? বরঞ্চ এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগরিষ্ঠ পশ্চিম-বঙ্গ স্থাপিত হইলে পারস্পরিক ভিত্তিতে (reciprocal basis) পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুগণ ও পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমানগণ ভদ্রভাবে থাকিবার সুযোগ পাইবেন।

অন্যথায়, হিন্দুপ্রধান পশ্চিম-বঙ্গ সকল সময়েই পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুর স্বার্থ দেখিতে পারিবে ও প্রয়োজন হইলে তাহাদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

বর্তমানের পরিস্থিতি একবার ভাবিয়া দেখুন। পূর্ববঙ্গে হিন্দুর উপর অত্যাচার হইলে সে কোথায় যায়? কলিকাতা হিন্দুপ্রধান। সেখানে ছুটিয়া আসে। হিন্দুপ্রধান জায়গা পাইলেই চলিয়া যায়। গত ১৯১১ সাল হইতে কি সংখ্যায় পূর্ববঙ্গবাসীগণ পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন। "পশ্চিমবঙ্গে"র দাবিতে মাত্র সেই factটি recognise করা হইতেছে। একটি হিন্দুপ্রধান পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশ থাকিলে সকল বাঙালী হিন্দুই সেখানে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন। এখন বাঙালী হিন্দু কোথায় যাইবে? তাহার Homeland কোথায়? দার্জিলিঙ হইতে বঙ্গোপসাগর, চট্টগ্রাম হইতে ছোটনাগপুর, সর্বত্রই মুসলিম লীগের শাসনাধীন। ভিন্নভাষাভাষী প্রদেশে তাহার স্থান নাই। পশ্চিম-বঙ্গ লইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ করিয়া বাঙালী হিন্দুর বাসভূমি রচনা করিতে হইবে। সেখানে তাহার কৃষ্টি, আদর্শ, ধর্ম, জ্ঞানচর্চা, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্যক্ পরিপুষ্ট লাভ করিবে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ন্যায় ধর্মোপদেষ্টা, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দার্শনিক কবি, জগদীশচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক, চিত্তরঞ্জনের ন্যায় রাজনৈতিক ও সুভাষচন্দ্রের ন্যায় নির্ভীক কর্মী আবার জন্মগ্রহণ করিবে। অন্যথায় পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বারো আনা হিন্দু প্রাণরক্ষার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করিবে ও চারি আনা বর্ণহিন্দুরা Jewদের ন্যায় জীবন যাপন করিবে। বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

আপনি অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে বাঙালী হিন্দু বাঁচিতে পারে তাহা বলেন নাই। অনেকে বলেন, "সঙ্ঘ-বদ্ধ" হও। সঙ্ঘ-বদ্ধ হওয়া খুবই প্রয়োজন। তাহাতে দাঙ্গা থামানোর সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু খালি দাঙ্গা থামাইয়া জাতি রক্ষা হয় না। শাসনশক্তি পাওয়া দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই।

* * *

আমরা গতবারে রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া এই আন্দোলনের গুরুত্ব বিচার করি নাই, এবারেও করিব না। কারণ সে দিক দিয়া আমরা মোটেই ওয়াকিবহাল নহি। সে বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যিনি সর্বাপেক্ষা বিশেষজ্ঞ, তিনি অনেক বিচারবিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন, এক গবর্নরের অধীনে দুইটি সাব-প্রভিন্স গঠন করা ছাড়া এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের আইনসঙ্গত

(গণপরিষদের অধীনে) উপায় নাই। যদি সম্ভব হয় শেষ পর্যন্ত তাহাই করিতে হইবে। আমরা সম্পূর্ণ সেন্টিমেণ্টের দোহাই দিয়া ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধী যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ফল কতদূর গড়ায় তাহাও ধৈর্যসহকারে দেখা কর্তব্য। সেন্টিমেণ্টকেও সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া চলে কি? ব্যাপক এবং বৃহৎভাবে হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য বাংলা দেশকে যদি পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলেই কি আমরা রক্ষা পাইব? পশ্চিম-বঙ্গ সংস্কৃতি শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি হইলেও পূর্ব-বঙ্গের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে আমরা বর্জন করিতে পারি না। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, জাতির সকল শক্তির উৎসরূপে এই বিজ্ঞানই একদিন আদৃত হইবে, তখন পূর্ব-বঙ্গের বিচ্ছেদ বাঙালীর বুকে কঠিন হইয়া বাজিবে; পূর্ব-বঙ্গ আমাদের উদ্যম প্রেরণা ও দৈহিক শক্তি জোগাইয়া আসিয়াছে, আহার্য ও ব্যবসায় সংক্রান্ত অসুবিধার কথা নাই তুলিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে আজ পর্যন্ত সমাজে রাষ্ট্রে ও শিক্ষায় যে সংস্কার বাংলা দেশে হইয়াছে, তাহার মূল প্রেরণা রামমোহন বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ প্রভৃতি পশ্চিম-বঙ্গবাসীদের নিকট হইতে আসিলেও সর্ববিধ সংস্কারকে কার্যকরী করিয়া বর্তমান রূপ দিবার কাজে সহায়তা করিয়াছে পূর্ব-বঙ্গ। স্থানমাহাত্ম্যেই সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য, এবং এ স্বাতন্ত্র্য মাত্র আজিকার নয়। মহাভারতের আমল হইতে ইহার জের চলিতেছে। পূর্ব-বঙ্গের অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বাঙালী-চিত্তের উৎকর্ষসাধনে কম সহায়তা করে নাই। স্থান পরিত্যাগে সেই মাহাত্ম্য বিনষ্ট হইতে বাধ্য। আসলে পূর্ব-বঙ্গ আমাদের যৌবন, পশ্চিম বঙ্গ অভিজ্ঞতা—দুইয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে মুসলিম লীগেরই বিজয় হইবে। অতিশয় সংখ্যালঘু পূর্ব-বঙ্গকে আমরা যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে পূর্ব-বঙ্গের যাবতীয় হিন্দু বাধ্য হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিবে। এই সকল কালাপাহাড়কে পাইলে পূর্ব-বঙ্গ পূর্ব-পাকিস্তানরূপে অজেয় হইয়া ক্ষীণপ্রাণ পশ্চিম-বঙ্গকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তবে পশ্চিম-বঙ্গ যদি বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে একাত্ম হইয়া যায় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা; স্বতন্ত্র কথা এই জন্য যে, তাহা হইলে আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক অস্তিত্বও আমূল বদলাইয়া যাইবে। একেবারে মনের খোল নলিচা না বদলাইয়া বাঙালীর পক্ষে পশ্চিম-প্রতিবেশীদের মানিয়া

লওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং আবার বলিতেছি, বর্তমান সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য অন্য পথ চিন্তা করিতে হইবে। বাঙালীর আর বাংলা দেশের যাহা নিজস্ব সম্পদ তাহা হইল বঙ্গসংস্কৃতি—পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমবেত সাধনায় তাহা বর্তমান রূপ লইয়াছে। দুইকে তফাৎ করিলে পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির স্থাপনা হইতে পারে, গৌরবান্বিত বঙ্গসংস্কৃতি, যাহা বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রকাশ্যে অথবা গুপ্তভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা আর বজায় থাকিবে না। পাটের অভাব বরদাস্ত করিতে পারিলেও পূর্ববঙ্গগীতিকার দেশকে, ভাটিয়ালি গানের দেশকে দূরে সরাইতে পারিব না। বিক্রমপুর পরগণাকে বাদ দিলে আমাদের অনেক ঐশ্বর্যই বাদ পড়িবে।

* * *

তবে যদি হেমন্তবাবুর পত্রোক্ত পূর্ব-বঙ্গবাসীরা পশ্চিম-বঙ্গকেই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট-অ্যাসেম্‌ব্লি-সম্মত সাব-প্রভিন্সের জন্যই আন্দোলন করিতে হইবে। তখন তাহাই হইবে এই ঘোরতর সমস্যার একমাত্র সমাধান। এ কাজ ঝানু রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের। তাঁহারা সমবেত শক্তি প্রয়োগ না করিলে কোনও কাজই হইবে না।

—

সরকারী ও বেসরকারী ভাবে বাংলার জনমতকে কণ্ঠরুদ্ধ করিবার বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর প্রয়াস সত্ত্বেও নানা দিক দিয়া নানাভাবে আমাদের কণ্ঠে যে বহুবিধ সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে; 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রয়াস শোচনীয়ভাবে কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় অনেক নিরুদ্ধ সুর পুনরুজ্জীবিত হইতেছে, নূতন সুরও শুনিতে পাইতেছি। পুরাতন 'জয়শ্রী' ও 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র দেশের কথা বলিবার নূতন উদ্যম আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে; ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির পক্ষে শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মাঙ্গলিকে'র মঙ্গল-ধ্বনিও কম শ্রুতিসুখবিধায়ক হইতেছে না। আমাদের সামাজিক জীবনে স্বাস্থ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে অব্যবস্থার অন্ত নাই, সেই অব্যবস্থা দূরীকরণের এইরূপ মহৎ চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়।

—

ভাল ভাল এবং প্রয়োজনীয় বই অনেক বাহির হইতেছে, পুস্তক-প্রকাশের রুচিও আমূল বদলাইয়া উন্নতির পথে চলিয়াছে। সিগনেট প্রেস,

বিশ্বভারতী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে তৎপর হইয়াছেন। যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বই আমাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাদের নাম করিতেছি—১। সরস্বতী লাইব্রেরি প্রকাশিত কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' তিন খণ্ড, এই বহু নিন্দিত-প্রশংসিত বইখানির সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ এই সর্বপ্রথম এ দেশে পাওয়া গেল। ২। সিগনেট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা'। ৩। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর 'মহাভারতের সমাজ' এবং ৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। ৫। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানির অনিল ব্যানার্জি ও দক্ষিণা ঘোষ সম্পাদিত ইংরেজী 'দি ক্যাবিনেট মিশন ইন ইণ্ডিয়া' এবং ৬। চারু বাঁড়ুজ্জের 'রবিরশ্মি'র নূতন সংস্করণ। ৭। কমলা বুক ডিপো প্রকাশিত মণীন্দ্রমোহন বসু রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রথম খণ্ড। ৮। ডি. এম. লাইব্রেরি প্রকাশিত ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের 'পরমায়ু'। ৯। নিউ এজ পাবলিসার্সের যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'। ১০। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত 'অপরাধ-বিজ্ঞান' দ্বিতীয় খণ্ড। ১১। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেডের বিভাস রায় চৌধুরী প্রণীত 'নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা' ২য় সং। ১২। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত 'সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গনে'। ১৩। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোম্পানির অনাথনাথ বসু প্রণীত 'Primary Education in India, Its future'। ১৪। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্সের প্রমথনাথ বিশী প্রণীত 'রবীন্দ্র-কাব্য নির্ঝর'। ১৫। এস. কে. মিত্র অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'জাতি-বৈর'। ১৬। বেঙ্গল পাবলিশার্সের অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'সমাজ ও বিবাহ', ১৭। জ্যোতিপ্রসাদ বসুর 'নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ', ১৮। সুপ্রসিদ্ধ রাসবিহারী বসুর 'বিপ্লবীর আহ্বান', ১৯। নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ সম্পাদিত 'ভারত ছাড়'। ২০। সিগনেট প্রেসের প্রমথনাথ সেনগুপ্ত অনুবাদিত সার্ জেম্‌স জিন্‌সের 'বিশ্বরহস্য'।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাবী ভারতের ভিত্তি

ব্যাপক আয়োজন চলেছে নব ভারতের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে। এই মহৎ কাজকে সফল ক'রে তুলতে হ'লে নানাভাবে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে এখন ব্যয়ের মাত্রা কমালে এক দিক থেকে পরোক্ষভাবে দেশ এবং প্রত্যক্ষভাবে আপনি লাভবান হবেন। ব্যয়কুণ্ঠ হ'লে শুধু যে বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে, তা নয়—আপনার সঞ্চিত অর্থ—তার পরিমাণ কমই হোক বা বেশি হোক—দশের উপকারে লাগে। কথাটা নতুন নয় বটে, কিন্তু অর্থ বিনিয়োগের সব চেয়ে নিরাপদ নির্ভরযোগ্য অথচ লাভজনক পন্থাটা জানা দরকার। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনলে এই সমস্যার অতি সহজেই মীমাংসা হ'য়ে যায়। আপনি নিজে যেমন এই সার্টিফিকেট কিনতে পারেন, তেমনি সব রকম প্রতিষ্ঠানও এই সার্টিফিকেট কিনে লাভবান হ'তে পারে।

কারণ

* বারো বছরে প্রতি দশ টাকা বেড়ে হয় পনেরো টাকা।
* সুদের উপর ইনকাম ট্যাক্স নেই।
* ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যেমন সহজেই কেনা যায় তেমনি আবার সহজেই ভাঙানো যায়।

এই সার্টিফিকেট বা সেভিংস স্ট্যাম্প কিনতে পারেন পোস্ট অফিসে, গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত এজেণ্টদের কাছে অথবা সেভিংস ব্যুরোতে। সবিশেষ জানতে হ'লে লিখুন: ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেক্টরেট, ১ চার্নক প্লেস, কলিকাতা ১।

ন্যা শ না ল সে ভিং স সা র্টি ফি কে ট